শ্রীসুনির্ম্মল বসু

চতুর্থ সংস্করণ

এস্, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স

১২ নং, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা।

মূল্য আট আনা।

প্রকাশক—
শ্রীসলিলকুমার মিত্র
এস, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স
১২ নং নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা

আশ্বিন, ১৩৪৬

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার
ক্ল্যাসিক প্রেস
২১নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

উপহার

—পরিচয়—

রাজার পাল্লায়

গরমের ছুটি হয়ে গেছে।

দু'টো মাস কি করে যে কাটাবো ভেবে অস্থির।

বন্ধুদের মধ্যে পচুরা কাল দার্জ্জিলিং চলে গেছে আর মণ্টুরা দেশে যাবার জন্যে গাঁটরী বোঁচ্কা বাঁধাছাঁদা করছে।

কাজেই আমার মনের অবস্থা বলবার নয়।

পচু আর মণ্টু এই দু'জনই আমার প্রাণের বন্ধু, ক্লাশে অন্য কারো সঙ্গে আমার তেমন দহরম মহরম ছিলনা।

মণ্টু চলে গেলে আমি যে কি করে দিন কাটাবো তাই ভেবে ছট্‌ফট্ করতে লাগ্‌লাম। পচু ত আগেই ভেগেছে।

যা হ'ক বরাৎ গুণে এক মহা সুযোগ এসে উপস্থিত।

পিসীমারা দল বেঁধে রাঁচি যাচ্ছেন, আমাদের ছুটি হয়ে গেছে দেখে আমাকেও তিনি সঙ্গে নিতে চাইলেন।

ভয় হয়েছিল হয়তো বাবা যেতে দেবেন না কিন্তু পিসীমার অনুরোধ বাবা ঠেল্‌তে পারলেন না ; কাজেই আমার রাঁচী যাওয়ার আর কোন বাধা রইলো না।

মা-বাবার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে পিসীমাদের সঙ্গে গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লাম। আনন্দে আমার মন দিশেহারা, কেননা বাংলাদেশ ছেড়ে কখনো বাইরে যাইনি। শুনেছি রাঁচী পাহাড়ের দেশ—চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড়, সেই সব পাহাড়ে কত লোক বেড়াতে যায়, চূড়ায় গিয়ে ওঠে—আমিও উঠ্‌ব, ওঃ সে কী মজা! তারপর বাড়ী ফিরে সেই সব গল্প করব অনু আর উমার কাছে।

অনু আর উমা আমার ছোট দুটি বোন। সত্যি উমার কথা ভাবতে আমার চোক দুটো জলে যেন ভরে এলো। উমা এখনো ভাল করে কথা বলতে পারে না —কিন্তু সব বুঝ্‌তে পারে। আমি যে তাদের ছেড়ে যাচ্ছি ঐটুকু মেয়ে তা বেশ বুঝতে পেরেছে। উমাকে ছেড়ে আমি কোনদিন কোথাও থাকিনি। আমি স্কুলে গেলে উমা আমাকে খুঁজতো, আর বাড়ী ফিরলেই ঝাঁপিয়ে কোলে এসে পড়তো।

আমি কোথায় যাচ্ছি, উমা তা জানে না তবু বুঝতে পেরেছিল যেন তাকে ছেড়ে কোথায় চলেছি।

বাড়ী থেকে বিদায় নেবার সময় একবার তাকিয়ে দেখলাম, উমা যেন ঠোঁট ফুলিয়ে আছে।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে টপ্ টপ্ করে দু' ফোঁটা জল আমার চোখ দিয়ে ঝরে পড়লো।

মা বলে দিয়েছিলেন যেন রাঁচিতে বেশী দেরী না করি। পিসীমা আমাকে দিন পনেরোর কড়ারে সঙ্গে নিয়েছিলেন।

রাঁচীতে এসে আমার আর স্ফূর্ত্তির শেষ নাই, কয়েকজন সঙ্গি জুটে গেছে। রাতদিন হুল্লোড় করে দিন কাটছে।

দীনুদা পিসীমার বড় ছেলে। শীকারে তাঁর হাত খুব পাকা। তিনি প্রায়ই আমাদের নিয়ে বনে জঙ্গলে গিয়ে নানান্ রকম পাখী শীকার করতেন। আর সেই সব পাখীর মাংস খুব গুলজার করে খাওয়া হোত।

একদিন ঠিক হোল সবাই মিলে চড়ুইভাতি করতে হবে। সুবর্ণ-রেখা নদীর ওপারে যে জঙ্গল আছে সেইখানে চড়ুইভাতির বন্দোবস্ত হোল। দলের দলপতি হলেন দীনুদা।

দিন ঠিক করে' সবাই মিলে নদীর ওপারের জঙ্গলে গিয়ে হাজির হলাম।

এক এক জনের ওপর এক একটা কাজের ভার পড়লো। কেউ রাঁধবে, কেউ যোগান দেবে,—কেউ পরিবেষণ করবে, কেউবা কাঠের বন্দোবস্ত করবে।

কাঠ সংগ্রহ করবার ভার পড়লো আমার উপরে।

শুক্‌নো ডাল পালা কাট্‌বার জন্যে একটা কুড়ুল নিয়ে আমি জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। কাঠের বন্দোবস্ত হ'লে রান্না চড়বে।—

গভীর জঙ্গল, শালের বন—কাছে জনমানবের সাড়া শব্দ নেই—গাছে গাছে বুনো পাখীদের গান শোনা যাচ্ছে। আমি কাঠের খোঁজে একটু দূরে এসে পড়লাম।

একটা শুকনো গাছ দেখে যেই কুড়ুল চালাতে যাব অমনি হঠাৎ কে জানি মোটা গলায় বলে উঠ্‌লো— "দাঁড়াও।"

ভাবলাম আমাদের দলেরই কেউ বুঝি আমার পেছনে এসে রসিকতা করছে।

কিন্তু তা তো নয়। তাকিয়ে দেখি সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি লোক অদ্ভুত চেহারায় আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটার চোখ জবাফুলের মত টক্‌টকে

লাল, সারা মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি, পরণে পায়জামা আর কয়েদীদের মত হাতকাটা ফতুয়া।

এ আবার কেরে বাবা? কাপালিক নাকি?

এ আবার কেরে বাবা ? কাপালিক নাকি ?

লোকটি আমার আরো কাছে এসে বল্লে—"কার হুকুমে কাঠ কাটতে এসেছ ?" আমি বল্লাম "কারো হুকুমে নয়, চড়ুইভাতি করব তাই কাঠের দরকার ; এ জঙ্গলটা আপনার তা আমার জানা ছিলনা—"

লোকটি আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লে—"হু আমি এই জঙ্গলের রাজা, তুমি অন্যায় কাজ করতে এসেছ—স্নতরাং তার সাজা ভোগ করতে হবে।"

এই কথা বলে সে আমার হাতের কুড়ুলটা কেড়ে নিল।

ভয়ে আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। ভাবলাম, চীৎকার করে' দীনুদাদের ডাকি, কিন্তু গলা থেকে স্বর বার হোলো না, ছুটে পালাতে গেলাম,—মনে হোলো, পায়ে যেন খিল্ এঁটে আছে !

লোকটি এক হাতে আমার ঘাড় ধরে আর এক হাতে কুড়ুলটা আমার গলার খুব কাছে এনে বল্লে "দেখবে মজা—ওয়ান, টু—"

এই রে—এক্ষুনি বুঝি ধড় থেকে মুণ্ডটা আলাদা হয়ে গেল ! একবার শেষ বারের মত কেঁদে নেব ভাব্লাম, কিন্তু চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও বার হলো না—ভয়ে চোখের জল' শুকিয়ে গেছে।

ওঃ লোকটার গায়ে কী ভীষণ জোর ; বাঁ হাত দিয়ে আমার ঘাড় ধরেছে, সেই চাপে মনে হচ্ছে যেন ঘাড়ের হাড়গুলো পটাপট্ ভেঙ্গে যাচ্ছে।

আমি অনেক কষ্টে শেষ বারের মত জিজ্ঞাসা করলাম, "কাঠ কাটলে যে এত বড় অপরাধ হয়, তা আমার জানা ছিল না—আর এটা যে আপনার রাজ্য তাও আমি জানতাম্ না—"

একটা হুঙ্কার দিয়ে, লোকটি বল্লে—"কেন জান্তে না, ঐ না জানার' জন্যেই তোমার গর্দ্দান যাবে। আগে তোমার কাণ কাটব, তারপর নাক, তারপর চোখ দুটো উপড়ে ফেলব, দাঁতগুলো পটাং পটাং করে তুলে ফেলব,—তারপর ঘ্যাচাং করে এই কুড়ুল দিয়ে—" এই বলে সে আমার নাকের সাম্নে ধারালো কুড়ুলটা নাড়্তে লাগ্লো।

জীবনের আশা একদম ছেড়েই দিয়েছি—এই রকম বেঘোরে প্রাণটা যাবে জানলে কে এই জঙ্গলে কাঠ কাট্তে আস্ত? কিন্তু যে রাজার পাল্লায় পড়া গেছে— উদ্ধার পাবার কোন উপায়ই দেখছি না।

রাজা বল্লে—"তোমাকে নিজের হাতে মারব না, আমার জল্লাদ তোমায় খতম করবে। নিজে হাতে তোমাকে মারলে রাজার মান্ যাবে। তুমি একটু দাঁড়াও,

—জল্লাদকে আমি ডেকে আন্‌ছি,—খবরদার পালিও না, তা হলে রাজার মান যাবে।" এই বলে রাজা আমাকে ছেড়ে গভীর বনের মাঝে ঢুকে পড়লো!

মহা সুযোগ উপস্থিত। রাজা অদৃশ্য হোলো আর আমিও দিলাম ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়। হাঁপাতে হাঁপাতে যখন দলের মধ্যে এসে পৌঁছুলাম তখন বেলা অনেক হয়ে গেছে।

দীনুদা তো চটে লাল। কাঠের জন্যে এতক্ষণ রান্না চড়ানো হয়নি। আমার গল্পটা সবাই গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতে চাইল। এমন ব্যাপারও নাকি আবার হতে পারে? এ কি রূপকথার রাজ্য!

সন্ধ্যাবেলা সবাই বাড়ী ফিরে শুনি সহরময় হৈ হৈ ব্যাপার। রাঁচীর পাগ্‌লা গারদ থেকে সকাল বেলা একজন পাগল পালিয়েছে—তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। লোকটার চেহারার বর্ণনা যে রকম শুন্‌লাম, তাতে আর বুঝতে বাকী রইল না, সে আর কেউ নয়—সেই জঙ্গলের রাজা! এতক্ষণ পরে ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা গেল। দীনুদাও ঘটনাটা এইবার বিশ্বাস করলেন।

কিন্তু রাজাকে আর পাওয়া যাবে কি করে? সে গেছে জল্লাদের খোঁজে।

সত্যি-গল্প

সারাদিন ঝমাঝম্ বৃষ্টি চলেছে—বাইরে যাবার যোটি নেই।

আমাদের বৈঠকখানায়—কাজেই গল্পের আসর বেশ জমে উঠেছে।

নানা গল্পের পর হঠাৎ সত্যদাস বল্লে—"আচ্ছা দেখি কে এমন গল্প বল্‌তে পারে যা হবে একেবারে খাঁটি সত্যি অথচ খুব মজার।"

সত্যদাসের কথা শুনে বৈকুণ্ঠ বল্লে "মজার গল্প বল্‌তে হলে ভাই একটু একটু বানানো চাই, তা না হলে গল্প জম্‌বে কেন?"

গোব্‌রা বল্লে—"আচ্ছা আচ্ছা, আমি তোমাদের একটা মজার গল্প শোনাচ্ছি, একেবারে খাঁটি সত্যি।"

বাইরে গুরুম্ গুরুম্ মেঘ ডাকছে, বৃষ্টিও তখন খুব জোরে নেমেছে।

ভালো করে আঁট সাঁট হয়ে বসে আমরা গোব্‌রার গল্প শুন্‌তে লাগলাম।

গোব্‌রা বল্‌তে লাগল—'বিশ্বকর্ম্মা পূজোর দিন অনেকেই ঘুড়ি ওড়ায়, আমিও একখানা ভালো পাট্‌নাই ঘুড়ি নিয়ে বিকেল বেলা আকাশে ওড়ালাম।

দিব্যি ফুর্‌ফুরে হাওয়ায় ঘুড়িও বেশ তর্ তর্ করে উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

আশে পাশে আরো অনেক ঘুড়ি উড়ছে, কোনটা লাল্, কোনটা নীল, কোনটা নানা রঙে রঙীন।

হঠাৎ একখানা শাদা রঙের ঘুড়ি এসে লাগালো প্যাঁচ আমার ঘুড়ির সঙ্গে! আমার স্থতোয় ছিল কাঁচের গুঁড়োর মাঞ্জা,—শাদা ঘুড়ি পারবে কেন? ঘ্যাচাং করে দিলাম তাকে কেটে। ঠিক এমনি সময়ে কোথা থেকে ছোট একটি নীল ঘুড়ি গোঁৎ খেয়ে পড়ল আমার ঘুড়িটার ওপর; তারপর চেয়ে দেখি আমার ঘুড়িটা স্থতোর বাঁধন ছেড়ে দিব্বি হেলে দুলে ইচ্ছা মতন উড়ে চলেছে।

এইবার আরম্ভ হোলো মজার ব্যাপার। পাক্‌ড়াশীদের উড়ে বামুন ছাদের ওপর লোহার উনুনটা ধরিয়ে সবে মাত্র ঘরে গেছে এমন সময় আমার ঘুড়ি উড়্‌তে উড়্‌তে এসে পড়ল সেই উনুনের আগুনে। দাউ দাউ করে আগুণ জ্বলে উঠল।

ঠিক উনুনটার পাশেই একখানা দড়িতে একটা শাড়ী

তাকে বাঁচাতে গিয়ে চাকর দাশুর পাগ্ড়ীতে গেল আগুন ধরে।

ঝুলছিল, আগুণের হল্‌কায় শাড়ীখানিতেও গেল আগুণ ধরে। দড়িটা পুড়ে যাওয়ায় সেই আগুণ ছাওয়া শাড়ীখানা ঝুপ্‌ করে নীচে পড়ে গেল।

নীচে ছিল খড়ের গাদা, জ্বলন্ত শাড়ী এসে তার ওপর পড়তে আর যায় কোথায়—একেবারে অগ্নিকাণ্ড!

পাক্‌ড়াশীদের একটা বাছুর খড় খাচ্ছিল, বেচারার মুখ পিঠ গেল ঝল্‌সে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে চাকর দাশুর পাগ্‌ড়ীতে গেল আগুণ ধরে।

এদিকে খড়ের আগুণ আর নিভ্‌তে চায় না,—পাকড়াশীদের বড় বাবু সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে দেখেন তাঁর সাধের বাড়ী ঘর সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

গোব্‌রার গল্প শেষ হতেই বসন্ত বল্‌লে "শোন এইবার জুলুর গল্প। একেবারে জ্বলজ্যান্ত সত্য, অবিশ্বাস করলে চলবে না। কিন্তু এই জুলু কে তা' আমি এখন কিছুতেই বলব না—শুধু চুপ্‌চাপ্‌ তোরা ঘটনাটা শুনে যা।

—সে দিন ঠিক এই রকমই বৃষ্টি হচ্ছিল,—আমি বাইরের ঘরে বসে আছি হঠাৎ শুনি রাস্তায় গোলমাল হচ্ছে। কে যেন করুণ স্বরে কাৎরাচ্ছে। তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে মুখ বের করে দেখি, দুটো গুণ্ডার মত

লোক জুলুকে বাঁশ নিয়ে তাড়া করেছে। মারের চোটে বেচারা খোঁড়াচ্ছে, ভালো করে ছুট্তেও পারছে না।

আমি তাকে তুলে এনে আশ্রয় দিলাম। বেচারী বোবা কথা বলতে পারে না। কি অপরাধ সে করেছে জানি না, লোক ছুটো কেনই বা তার পা ভেঙ্গে দিয়েছে তাও মালুম করতে পারলাম না। জুলুকে ঘরে এনে কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝ্লাম জুলু কোন দোষ করতে পারে না, এত ভালো সে।

তারপর থেকে জুলু আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতেই রইল। বেচারীর বয়স খুব কম, আত্মীয় স্বজন তার কেউ ছিল না।

ঠাকুরমা কিন্তু জুলুকে ছুটি চক্ষে দেখ্তে পারতেন না। কেবলি বলতেন—'কি যে করিস ওটাকে নিয়ে—ছুঁলে নাইতে হয়! ছি-ছি দে, দে, দূর করে দে বাড়ী থেকে।' ঠাকুরমার কথায় আমি কাণ দিতাম না।

জুলু কথা বলতে পার্তো না—কিন্তু ইসারা ইঙ্গিতে মনের ভাব সব জানাত। ঠাকুরমা যে তাকে ছু'চোখে দেখতে পারেন না তা সে বেশ বুঝতে পারত। কতবার তার চোখের জল আমি রুমাল দিয়ে মুছে দিয়েছি।

একদিন বাড়ী এসে দেখি জুলু খুব কাঁদছে। ব্যাপার

কি জানতে পারলাম। জুলু ভুল করে ঠাকুরমার রান্না ঘরে ঢুকেছিল তাই তিনি তাকে জ্বলন্ত একখানা চেলাকাঠ ছুঁড়ে মেরেছেন। দেখলাম জুলুর পিঠের খানিকটা ঝলসে গেছে।

ওষুধ পত্তর দিয়ে তার পিঠটা বেঁধে দিলাম, ঠাকুরমার উপর হোল ভয়ানক রাগ। কী এমন দোষ করেছে সে যার জন্যে এই শাস্তি! ভাবলাম জুলুকে এইবার বিদায় দেব—এখানে থাক্‌লে বেচারাকে অনেক দুর্ভোগ সইতে হবে।

কিন্তু তাকে বিদায় দিতে হোলনা সে নিজেই একদিন বিদায় নিল।

জুলুকে নিয়ে একদিন পাহাড়ে বেড়াতে গেছি। আমার সঙ্গে সঙ্গে সেও পাহাড়ের উপর উঠ্‌ল। আজ তার ভারী আনন্দ, চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল —চারিধারের সৌন্দর্য্য আজ তাকেও মাতিয়ে তুলল।

পাহাড়ের একেবারে চূড়োয় একটা হেলানো পাথর ছিল, লাফিয়ে লাফিয়ে জুলু গিয়ে তার ওপর উঠ্‌ল। অত উঁচুতে ওঠা ঠিক নয়। আমি ডাকলাম 'জুলু জুলু ফিরে আয়।' কিন্তু জুলু আজ আর আমার কথা শুন্‌ল না— আজ সে প্রথম আমার কথার অবাধ্য হোল।

হঠাৎ হোল ভয়ঙ্কর একটা শব্দ। তাকিয়ে দেখি, সেই হেলানো পাথর খানা জুলুকে নিয়ে সশব্দে নীচে গড়িয়ে পড়ছে, ওঃ সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য। তাকে বাঁচাবার কোন উপায় নেই! এতক্ষণে বোধ হয় তার হাড় পাঁজ্‌রা গুঁড়ো হয়ে গেছে।

ছুটতে ছুটতে নীচে নামলাম। দেখ্‌লাম জুলুর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাকে আর চেনবার উপায় নেই। চারিদিকে রক্তের ঢেউ বয়ে চলেছে। পাথরের চাপে বেচারা থেত্‌লে গেছে।

তখনো প্রাণটুকু যায় নি, বোধ হয় শেষ নিশ্বাস ছাড়বার যোগাড় করেছে। আমি ডাক্‌লাম 'জুলু-জুলু!' কষ্টে সে আমার দিকে তাকালো তারপর একবার লেজ নেড়ে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেল।

বসন্তের গল্প এতক্ষণ আমরা একমনে শুনে যাচ্ছিলাম।

এইবার সত্যদাস বল্লে "হুঁ, এতক্ষণ পরে বোঝা গেল তোমার জুলুটি কে, আমরা তো তাকে মানুষ ভেবেই গল্প শুন্‌ছিলাম। ভাগ্যিস্ মরবার সময় লেজটা নেড়েছিল, নইলে কি আর কুকুর বলে ধরা যেত?"

বসন্ত বল্লে "প্রথম থেকেই যদি জুলুর পরিচয়টা দিতাম তা হলে কি আর এতখানি মনোযোগ দিয়ে এ গল্পটা শুনতে?"

কবিরাজী ওষুধ

শরীরটা ভালো ছিলনা। নাড়ীটা দেখবার জন্যে কবিরাজের বাড়ীতে এলাম।

কবিরাজ মহাশয়ের বয়স হয়েছে, গ্রামের কবিরাজ হলেও তাঁর হাত যশ আর প্রতিপত্তি খুবই।

অনেক কঠিন কঠিন রোগ তাঁর ওষুধের গুণে অল্প দিনে আরাম হয়েছে,—তাই তাঁকে খাতির করত গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সকলেই।

আমার নাড়ী দেখে কবিরাজ বল্লেন, "সামান্য সর্দ্দির ভাব দেখা যাচ্ছে, আচ্ছা ওষুধ দিচ্ছি,—আজকেই কমে যাবে।"

এই বলে কবিরাজ মশাই তাকের ওপর থেকে একটা বোতল নামিয়ে কয়েকটি বড়ি আমাকে খেতে দিলেন।

আরো কয়েকজন রোগী এসে বসেছিল, সকলের রোগ পরীক্ষা করে কবিরাজ মশাই তাদেরও ওষুধের ব্যবস্থা করে দিলেন।—

পাড়ার গোবর্দ্ধনদার পেটের অসুখ হয়েছিল—কি একটা পাঁচন কবিরাজ মশাই তাকে খেতে দিলেন।

শরীরটা খুবই খারাপ—বাড়ী এসে আর কিছু না খেয়ে তাড়াতাড়ি চাদব মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম—কবিরাজ মশাইয়ের ওষুধের গুণে ওবেলায় হয়তো ভাল বোধ করতে পারি।

কিছুক্ষণ পরে ওঃ সে কি কাণ্ড। অসহ্য পেটের যন্ত্রণা আরম্ভ হলো। মনে হতে লাগ্‌লো যেন পেটের নাড়ীভুঁড়ি সব ছিড়ে বেরিয়ে যাবে!

পেটের যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে পড়লাম। আর শুয়ে থাক্‌তে না পেরে উঠে বস্‌লাম, এভাবে কতক্ষণ বসা যায়, পাগলের মত উঠে ছুটাছুটি আরম্ভ করলাম!

যাতনা ক্রমেই বাড়তে লাগ্‌লো, চোখে সরষে ফুল, ধুত্‌রো ফুল এই সব দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। সর্দ্দি সারাতে গিয়ে একি বিপদ!

বাড়ীতে কেউ নেই—কিছুদিন হলো সবাই তীর্থ ভ্রমণে গেছে। কেউ যে গিয়ে কবিরাজকে খবর দেবে তারও জো নেই, চাকরটাও কাজকর্ম্ম সেরে এ বেলার মত বাসায় চলে গেছে।

ভাব্‌লাম কোনরকমে গিয়ে গোবর্দ্ধনদাকে খবর দিই, গোবর্দ্ধনদা কবিরাজকে ডেকে আন্‌বে।

গোবর্দ্ধনদার বাড়ী আমাদের বাড়ীর পাশেই।

কোনো রকমে লাঠিতে ভর দিয়ে গোবর্দ্ধনদার বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম।

একি! গোবর্দ্ধনদা পাগল হলো নাকি!

গিয়ে দেখি গোবর্দ্ধনদা ভীষণ ভাবে হাত পা ছুঁড়ে লাফ মারছে, বাড়ীর সকলে কোন উপায়ে তাকে সাম্‌লাতে পারছে না।

কেউ ধরেছে তার হাত, কেউ ধরেছে পা, কেউ তার কোমর জড়িয়ে ধরেছে। তবু গোবর্দ্ধনদার চাঁটি আর লাথির কামাই নেই। চাঁটি আর লাথির চোটে সকলে দস্তুর মত কাহিল।

গোবর্দ্ধনদার মুখে কোন কথা নেই। খালি গোঁ গোঁ আওয়াজ।

এ কি ভূতুড়ে ব্যাপার! কাণ্ড দেখে আমার পেটের যাতনা যেন কমে গেল—কিন্তু গোবর্দ্ধনদার এক বিরাশি সিক্কার ঘুসি গিয়ে আমার পিঠের শিরদাঁড়া ভাঙ্গবার জো।

ওঝা ডাকা হোলো, কিন্তু ঝাড়্‌ফুঁকে কোন ফল হোলো না—উল্টে গোবর্দ্ধনদার লাফ্‌ঝাঁপের বহর আরো বেড়ে গেল।

কবিরাজের বাড়ী লোক পাঠানো হোলো কিন্তু কবিরাজের নতুন শিষ্য কেবল্‌রাম বলে পাঠালো—

কবিরাজমশাই কিছুক্ষণ আগে রোগী দেখ্‌তে অন্য গ্রামে গেছেন; ফিরতে অনেক রাত হবে।

গিয়ে দেখি গোবর্দ্ধনদা ভীষণ ভাবে হাত পা ছুঁড়ে লাফ্‌ মার্‌ছে।

কোনো রকমে সেদিনটা কাট্‌লো। পরের দিন ভোরের বেলা সটান্ গিয়ে হাজির হলাম কবিরাজের বাড়ী।

সমস্ত ব্যাপার শুনে কবিরাজ মশাই বল্লেন "কি রকম? আমার ওষুধের ক্রিয়া এরকম হোল কি করে? সব ওষুধ আমি নতুন তৈরী করেছি—।" এই বলে তিনি শিষ্য কেবল্‌রামকে ওষুধের বোতলগুলি আন্‌তে বল্লেন।

কিছুক্ষণ পরীক্ষা করার পর তিনি হঠাৎ চটে গিয়ে খড়ম তুলে কেবল্‌রামকে মারতে উঠ্‌লেন।—

কেবলরামের কি দোষ বুঝতে পার্‌লাম না। কবিরাজ মশাই ভীষণ গর্জ্জন করে বল্লেন—"হতভাগা সব মাটী করেছিস। বোতলের গায়ে যে লেবেল' আঁটতে দিয়েছিলাম তা উল্টো পাল্টা করে লাগিয়েছিস?"

এই বলে কবিরাজ মশাই আমাকে বুঝিয়ে বল্লেন "যাক আর ভয় নেই, লেবেল উল্টো পাল্টা হবার দরুণ তোমাকে সর্দ্দির ওষুধের বদলে কড়া জোলাপের বড়ি দিয়েছে, আর বেচারী গোবর্দ্ধনকে পাঁচন না দিয়ে কেব্‌লা খাইয়েছে বাতের মালিশ। যাক্ ফাঁড়া কেটে গেছে। যত দোষ ঐ হতভাগা কেব্‌লাটার!"

———

দামুর কীর্ত্তি

নতুন চাকরটাকে নিয়ে ভারী মুশ্‌কিলে পড়া গেছে।

লোকটা কাজে ফাঁকি দেয় না বটে, তবে বুদ্ধি স্থদ্ধি করে' কিছু করিতে গেলেই তার মাথার সব তাল্‌গোল পাকিয়ে যায়। অর্থাৎ তার বুদ্ধি বেশ একটু মোটা।

তা' ছাড়া তার একটা প্রধান দোষ সে কাণে কথা শোনে কম।

যদি তাকে বলা যায়—"দামু, যা বাজার থেকে রুই মাছ কিনে আন্!" অমনি দেখা যাবে, দামু পুঁই গাছ এনে জড়ো করেছে।

একবার বাড়ীতে কুটুম এসেছে। দামুকে টাকা দিয়ে বল্লাম "ভালো দেখে পাঁঠা কিনে আন তাড়াতাড়ি।"

দামু যখন বাজার থেকে ফিরল—দেখা গেল, তার মাথায় একরাশ ঝাঁটা।

পাঁঠার বদলে সে ঝাঁটা কিনে এনেছে।

আর একদিন হলো এক মজার ব্যাপার। তালুই মশাই দেশ থেকে কিছু দিনের জন্যে আমাদের বাড়ী এসে

উঠেছেন। ভোর বেলা আমি দামুকে বল্লাম—"যা শীগ্‌গির বাবুর হাতে গাড়ু দিয়ে আয়।"

দামু তাড়াতাড়ি গিয়ে তালুই মশাইয়ের হাতে একখানা ঝাড়ু গুজে দিল।—

তালুই মশাই অবাক।

এই রকম নানা ফ্যাসাদ করে বসে।

বিরক্ত হয়ে ভাবি, অন্য চাকর রাখব কিন্তু সে কথা শুনলে দামু হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। বেচারী বড় গরীব, তার তিন কুলে কেউ নেই। সত্যি, দামুটার জন্যে মায়াও হয়। তাই ইচ্ছে থাক্‌লেও তাকে ছাড়াতে পারি না।

মা একদিন দামুকে বল্লেন—"যা তো দামু, ভুতোর দোকান থেকে বঁটি কিনে নিয়ে আয়।"

দামু গিয়ে জুতোর দোকান থেকে চটি কিনে এনে মাকে দিল। কোথায় ভুতোর দোকানে বঁটি আর কোথায় জুতোর দোকানের চটি। মা তো হেসেই আকুল! বল্লেন—"যা যা শীগ্‌গির ফেরৎ দিয়ে আয়—চটি চাই নি, বঁটি চেয়েছি।"

দামু লজ্জায় আধমরা হয়ে জিভ্‌ কেটে চলে গেল, আর কিছুক্ষণ পরে নিয়ে এলো ঘটী কিনে।

তার কাণ্ড দেখে রাগ্‌তে গিয়ে হেসে ফেলি। এমন অদ্ভুত ব্যাপার আর কেউ দেখেছে কিনা সন্দেহ।

আমাদের বাগানে একটা পুরোনো জবা ফুলের গাছ ছিল। গাছটাতে ফুল আর হতো না, ক্রমেই সে শুকিয়ে আস্‌ছে। তাই দামুকে ডেকে বল্লাম "ফুল গাছটা কেটে ফেলিস।"

ঘণ্টা খানেক পরে ফিরে এসে দেখি সর্ব্বনাশ—আমাদের দামী নারকেলী কুল গাছের দফা দামু বাবাজী খতম করেছে! ফুল গাছের বদলে কুল গাছের দফারফা।

আর একবার দামু এক ঝুড়ি মুড়কির বদলে এক কুড়ি মুরগী কিনে বাড়ীতে হৈ চৈ লাগিয়ে দিয়েছিল। কাকা পরম বৈষ্ণব, তিনি সেদিন দামুকে খড়ম পেটা করে ছেড়েছিলেন।

মামাতো বোনের বিয়েতে মামাবাড়ী এসেছি। সঙ্গে এসেছে দামু।

দামুকে বিশেষ সাবধান করে দিলাম—"দেখিস একটু বুঝে সুঝে চলিস, না হলে কিন্তু ভয়ানক অপদস্থ হতে হবে।"

বিয়ে বাড়ীতে হৈ হৈ ব্যাপার। বরযাত্রীরা সব এসে গেছে। রাত্রে বিয়ে, ভোর থেকে শানাই বাজ্‌ছে—

ছুটোছুটি হাঁকাহাঁকি. ডাকাডাকি,—একেবারে হৈ চৈ কাণ্ড।

মামাবাড়ীর চাকরদের দলে দামুও মিশে গেছে, সকাল থেকে তার কাজেরও অন্ত নেই।

সন্ধ্যা বেলায় হুলুস্থুল কাণ্ড। বরযাত্রীরা ভয়ানক ক্ষেপে গেছে। নতুন জামাই বলে বস্‌ল—"এই ছোট-লোকের বাড়ীতে আমি কিছুতেই বিয়ে করব না।"

এ আবার কি ব্যাপার! সবাই বলে—"কি হোলো, কি হোলো?"

মামা দস্তুর মত ঘাব্‌ড়ে গেলেন, এত আয়োজন সব পণ্ড হবে,—আর এখন মেয়ের বিয়ে না হলে লোকেই বা বল্‌বে কি!

ব্যাপারটা জান্‌বার জন্যে আমরা দল বেধে চল্লাম বরযাত্রীদের আস্তানায়। হাত জোড় করে বল্লাম "আপনারা মিছামিছি রাগ করবেন না, কোন ত্রুটি হয়ে থাকলে ক্ষমা করুন!"

বরের বাবা মুকুন্দ বাবু বল্লেন "না মশাই এমন অভদ্র লোকের ঘরে আমি ছেলের বিয়ে দিতে পারব না, এরকম চাকর দিয়ে অপমান করবার অর্থটা কি?"

বরযাত্রীদের মধ্যে একটি ছোক্‌রা উত্তেজিত হয়ে

বল্লে—"মশাই,—মানহানির মোকদ্দমা আনবো, ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি?"

শ্রীমান্ দামু শুনলেন "ছেলের বাবাকে দাড়ী ধরে নিয়ে আয়"

শেষে ব্যাপারটা বোঝা গেল। মামা দামুকে বলেছিলেন "ছেলের বাবাকে গাড়ী করে নিয়ে আয়।" আর শ্রীমান দামু শুন্‌লেন "ছেলের বাবাকে দাড়ী ধরে নিয়ে আয়।" ব'স্ সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল। তাই এই কাণ্ড।

যাক্, অনেক ক'রে বুঝিয়ে বরযাত্রীর দলকে ঠাণ্ডা করা গেল।

দামুকে আমি বল্লাম—"তুই চুপ চাপ ব'সে ব'সে খা আর ঘুমো,—কাজ কর্ম্ম তোকে করতে হবে না।"

———

কিপ্‌টের সাজা

বুড়ো আর বুড়ী তুজনেই নামজাদা কিপ্‌টে। ভোরে উঠে তাদের নাম করলে হাঁড়ি ফেটে যায়।—

তাদের বাগানের গাছে এমন ফল নেই যে ফলে না!

কিন্তু তা হ'লে হবে কি,—সে ফল খেতে পাবে, এমন আশা কেউ কোন দিন করে না।

বুড়ো বুড়ীর ছেলে পিলে কেউ নেই। সারাদিন বুড়ী বসে বাগান পাহারা দেয়, আর বুড়ো জাগে সারারাত ধ'রে।

কাজেই আমাদের মনে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোন দিন তাদের বাগানের ফলের এক টুক্‌রো কখনো চেখে দেখতে পারি নি!

তার ওপর বুড়ী ভারী বদ্‌-মেজাজী; একদিন ভাব্‌লাম, বুড়ীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে কিছু ফল চেয়ে নেব। কিন্তু বুড়ীর গালাগালির চোটে আমরা পালাতে পথ পাই নে!

বুড়ো বুড়ী ঐ সব ফল বাজারে বিক্রী করে, আর ঘরে টাকা জমায়।—

অনেক সময় কত ফল তাদের বাড়ীতে পচে নষ্ট হয়, তবু পাড়ার ছেলেদের হাত তুলে দিতে জানে না !

একদিন স্কুল থেকে ফেরবার পথে দেখ্‌লাম, বুড়োদের খাজা কাঁঠালের গাছে কাঁঠাল পেকেছে ।

সবাই মিলে চিন্তা করতে লাগ্‌লাম কি ক'রে কাঁঠাল চুরি করা যায় ।

জগত্তারণ বল্লে—"এক কাজ করা যাক্, সন্ধ্যেবেলা বুড়ী যখন বাড়ী ফিরবে--ঠিক বুড়ো আস্‌বার আগে—তখন কাঁঠাল সরাতে হবে !"

জগত্তারণের কথা শুনে নন্দ বল্লে—"আরে ছ্যা, ওদের অত বোকা ভাবিস্ নে। বুড়ো যতক্ষণ বাগানে এসে না পৌঁছোয় বুড়ী ততক্ষণ সেখান থেকে এক পা নড়ে না।"

জগত্তারণের কথা শুনে আমাদের সকলেরই খুব উৎসাহ হয়ে ছিল, কিন্তু নন্দর কথা শুনে তখনি একদম্ দমে গেলাম।

জগত্তারণ বল্লে—"তবে এক কাজ করা যাক্,—বুড়ো সমস্ত রাত নিশ্চয়ই জাগে না, গাছের তলায় খাটিয়া পেতে নির্ঘাৎ ঘুম লাগায়। অমন বুড়োও কি সমস্ত রাত জাগ্‌তে

পারে! তাই বলি কি, ছ্যাখ্‌ আজ আমি নিশ্চয়ই কাঁঠালের একটা ব্যবস্থা করব।"

পালা, পালা, বুড়ো লাঠি নিয়ে তেড়ে আস্‌ছে-

ঠিক্ হোলো, শেষ রাত্রে গিয়ে জগত্তারণ কাঁঠাল চুরি করবে। আমরাও ঠিক্ কর্‌লাম জগত্তারণের সঙ্গে গিয়ে তাকে সাহায্য করব। কিন্তু আমরা থাক্‌ব বাগানের বাইরে। যদি জগত্তারণ বিপদে পড়ে, তখন তাকে উদ্ধার করতে হবে তো!

শেষ রাত্রে সবাই চুপি চুপি গিয়ে হাজির হলাম বুড়োর বাগানে। বুড়ো নাক ডাকিয়ে ঘুম দিচ্ছে,—সামনে মিট্ মিট্ ক'রে একটা কেরোসীনের লণ্ঠন জ্বলছে!

বুড়োর নাক ডাকার আওয়াজ আমরা স্পষ্ট শুন্‌তে পেলাম।

জগত্তারণ পা টিপে গিয়ে দাঁড়ালো গাছ তলায়। তারপর আস্তে আস্তে দিল আলোটা নিবিয়ে। এখন গাছে উঠ্‌তে পারলেই কার্য্য সিদ্ধি।

আমরা সবাই ওৎ পেতে বাইরে বসে আছি। একটু পরেই জগত্তারণ কাঁঠাল নিয়ে আসবে—তারপর- সে কী—মজা! আমাদের সকলের জিভ্ রসিয়ে উঠ্‌ল।

জগত্তারণ একটু পরেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে এসে বল্লে "পালা পালা' বুড়ো লাঠি নিয়ে তেড়ে আস্‌ছে, আমার পায়ের দফা শেষ" এই বলেই সে পাঁচীল ডিঙ্গিয়ে

দিল পিট্‌টান,—আমরাও যে যেদিকে পারি দিলাম চোঁ-চা দৌড়।

কিন্তু না, ছাড়া হবে না। বুড়োর কাঁঠাল খেতেই হবে যেমন করে হোক। আমাদের রোখ্ চেপে গেল!

সবাই মিলে কেবলি তখন ফন্দি আঁটতে লাগলাম কি উপায়ে বুড়ো বুড়ীকে ঠকিয়ে কাঁঠাল খাওয়া যায়!

মন্টু বল্লে—"অত ভাবনা চিন্তার দরকার কি,—পয়সা দিয়ে ওদের কাছ থেকে কাঁঠাল কিনে আনলেই হয়! ওরা তো ফল বিক্রী করে,—অনর্থক গোলমাল ক'রে লাভ কি! কাঁঠাল খেতে ইচ্ছা হয়েছে,—আয় সবাই মিলে চাঁদা করে কিনে আনি। ওরাও খুসী হবে আমরাও নির্ব্বিঘ্নে কাঁঠাল খাবো।"

জগত্তারণ বল্লে—"আরে না না, পয়সা দিয়ে কাঁঠাল তো সবাই খেতে পারে, সে খাওয়ায় কোন মজা নেই। বুড়ো বুড়ীকে জব্দ করতেই হবে। যেমন ওরা বুনো ওল, আমাদেরও তেমনি বাঘা-তেঁতুল হওয়া চাই। সেদিন আমার পায়ে লাঠি ছুঁড়ে এমনি মেরেছে যে আজও সে ব্যথা সারে নি। ওদের জব্দ করতেই হবে।"

হঠাৎ একটা ফন্দী জগত্তারণের মাথায় জাগলো।

সে ফন্দী আমাদের সকলেরই বেশ মনের মত হলো।

অমাবস্যার ঘুট্ ঘুটে রাত্রি। চারিদিক্ ঝিম্ ঝিম্ করছে। বুড়ো বাগান আগ্‌লে বসে আছে। এমন সময় একজন দৌড়ে গিয়ে বুড়োকে খবর দিল "বুড়ীর ভেদ্ বমি আরম্ভ হয়েছে,—শীগ্‌গির বাড়ী যেতে হবে,—অবস্থা খুব খারাপ।"

খবর পেয়ে বুড়ো তাড়াতাড়ি ছুট্‌লো বাড়ীর দিকে।

এদিকে আমাদের আর একজন গিয়ে বুড়ীকে খবর দিল—"বুড়োকে বাগানে সাপে কাম্‌ড়েছে,—শীগ্‌গির যাও।"

চীৎকার করতে করতে বুড়ী ছুট্‌লো বাগানের দিকে।

আমাদের আগে থেকেই সব ঠিক ঠাক ছিল। এই সুযোগে জগত্তারণ গিয়ে ভালো দেখে কটা কাঁঠাল ঝপাঝপ্ পেড়ে ফেল্লে। আর আমরা এদিকে বুড়ীর বাড়ীতে ঢুকে নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে এক ধামা ল্যাংড়াই আম সরিয়ে ফেল্লাম।

তারপর খ্যাঁটের যা ব্যাপার—সে কথা আর কি বলব্।

ঈষাখাঁর বিপদ

পূজোর ছুটি এসে পড়লো।

ছুটির মধ্যে কি আমোদ-আহ্লাদ করা যায় তাই আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় হয়ে পড়লো।

ক্লাশের পড়াশোনা আর ভালো লাগেনা, ছুটি হোলে যেন বাঁচি।

আমাদের বাংলার মাষ্টার অংশু বাবু ভারী আমুদে লোক।

একদিন তিনি আমাদের বল্লেন—"তোমাদের মধ্যে কে ভালো অভিনয় করতে পারে?"

অভিনয়ের দিকে আমার বেশ একটু ঝোঁক ছিল। 'আবৃত্তি করে' অনেকবার আমি প্রাইজ আর মেডেল পেয়েছি।

অংশু বাবুর প্রশ্ন শুনে ক্লাসের সবাই আমাকে দেখিয়ে বল্লে—"স্যার, নিমুখুব ভালো play করতে পারে—।"

অংশুবাবু বল্লেন—"পূজোর বন্ধের দিন আমরা ইস্কুলে রবিবাবুর 'মুকুট' বইখানি ছেলেদের দিয়ে অভিনয় করাতে চাই। যে যে ভালো অভিনয় করতে পার, আজ বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করবে—part বুঝিয়ে দেব।"

আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লাম। যেদিন অভিনয় হবে সেই দিনটা যেন কল্পনার চোখে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম, ভীড়-ভীড়-ভীড়, কত লোক দেখতে এসেছে। আমাদের বাড়ীর সবাই দেখ্‌তে এসেছে,—সমস্ত মাষ্টারের দল বসে দেখছেন, শহরের সব বড় বড় লোক এসেছেন—আর তার মাঝে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে পোষাক পরে আমরা ষ্টেজে দাঁড়িয়ে প্লে করছি। হাততালির উপর হাততালি, ওঃ সে—কী আনন্দ।

অভিনয়ের হুজুগে মেতে আমরা খাওয়া-দাওয়া প্রায় ভুলে গেলাম।

ঈষার্থীর 'পার্ট' করতে হবে আমাকে। রীতিমত মহলা চল্‌তে আরম্ভ করল। যারা যারা অভিনয় করবে হেড্‌মাষ্টার তাদের ছুটি মঞ্জুর করলেন।

একদিন মহলা দিচ্ছি, এমন সময় হেড্‌মাষ্টার এসে বল্লেন—"ভালো করে সকলে পার্ট মুখস্থ করবে। দেখো শেষে যেন গোলমাল না হয়। জমীদার প্রাণকান্ত বাবু বলে পাঠিয়েছেন,—তোমাদের মধ্যে যে সব চেয়ে ভালো অভিনয় করবে তাকে তিনি একটি রূপোর মেডেল দেবেন।"

মহলার সময়ে আমার অভিনয়ের কায়দা আর রকম-

সকম দেখে অংশুবাবু বল্লেন—"মেডেলটা এবার নিমুর ভাগ্যেই আছে দেখছি।" আমার উৎসাহের আর সীমা নাই।

দেখতে দেখতে অভিনয়ের দিন এসে পড়ল। সেদিন আমাদের ওঃ সে কী—দিন!

চমৎকার "ষ্টেজ" বাঁধা হোলো, সন্ধ্যা হতে না হতেই লোক আস্‌তে আরম্ভ করেছে। শহরের সেরা কনসার্ট-পার্টি এসে বাজনা বাজাতে সুরু করে দিল।

আমরা সাজ পোষাক কর্‌ছি—। অংশু বাবুর শালা কল্‌কাতা থেকে এসেছেন, তিনি আমাদের সাজিয়ে দিচ্ছেন, তাঁর খুব পাকা হাত এসব বিষয়ে।

হেড্‌মাষ্টার মশাই বারেবারে এসে আমাদের উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন।

ঈষাখাঁর পোষাকে আমাকে যা মানাচ্ছিল তা' আর কি বলব! লম্বা দাড়ী আর চোগা-চাপ্‌কানের বহর দেখে কে বলবে আমি শ্রীমান নিমাই চরণ গোস্বামী।

অভিনয় সত্যিই জমে গেল। আমি যখনই 'ষ্টেজে' এসে দাঁড়াই তখনি অমনি চটাচট্‌ চটাচট্‌ হাততালি। কিন্তু এর ভিতরও আমার দুঃখ হচ্ছে যে আমাদের বাড়ীর কেউ আস্‌তে পারে নি—বাড়ীতে সেদিন কি একটা পূজো ছিল।

অভিনয় শেষ হোলো। হেড্মাষ্টার মশাই দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন—"আমাদের জমীদার বাবু শ্রীপ্রাণকান্ত মজুমদার মহাশয় ঈষাখাঁর ভূমিকায় মুগ্ধ হয়ে শ্রীমান নিমাই চরণ গোস্বামীকে একটি মেডেল উপহার দিচ্ছেন।

চারিদিকে হাত্তালি পড়ে গেল। অংশুবাবু আমার পিঠ্ চাপ্ড়ে বল্লেন—"সাবাস নিমু! তুমিই আজ স্কুলের মান রক্ষা করেছ—।"

অনেক রাত্রে অভিনয় শেষ হোলো। দুঃখ হোল বাড়ীর কেউ এমন জিনিষটা দেখ্তে পেল না!

ভাব্লাম যাই, এই ঈষাখাঁর বেশেই বাড়ীতে গিয়ে হাজীর হই। দেখি কেউ ধরতে পারে কি না।

রাত্রি তখন অনেক। বাড়ী গিয়ে দেখি সবাই ঘুমে অচেতন! বাইরের ঘরে ঠাকুর্দ্দা ঘুমোচ্ছিলেন! কড়া নাড়তে লাগলাম। ঠাকুর্দ্দা উঠে দরজা খুলেই দেখেন সাম্নে এক মুসলমান ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

এতো রাত্রে এ আবার কে রে বাবা! ঠাকুর্দ্দা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কে"?

আমার ভারী মজা বোধ হোলো। কোন উত্তর দিলাম না, আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে পায়চারী করতে লাগলাম।

এতো রাত্রে এ আবার কে রে বাবা !

ঠাকুর্দ্দা দেখ্‌লেন গতিক ভালো নয়। ঝট্‌ করে বাইরে বেরিয়ে দরজার শিকল এঁটে তিনি চীৎকার করতে লাগলেন—"চোর—চোর—ডাকাত,—গুণ্ডা।"

ঠাকুর্দ্দার চীৎকারে বাড়ীর সবাই জেগে উঠ্‌ল।

কাণ্ডটা যে এতদূর গড়াবে তা আমার ধারণাতেই আসে নি।

আমি চীৎকার করে বল্লাম—"ঠাকুর্দ্দা—আমি—আমি!" কিন্তু কে কার কথা শোনে।

ততক্ষণ বাড়ীর সবাই জেগে উঠে—লাঠি, সোঁটা, যে যা হাতের সামনে পেয়েছে, নিয়ে সোজা হাজীর হয়েছে ঠাকুর্দ্দার ঘরের কাছে।

ছোটমামা সোজা চলে গেলেন পুলিশে খবব দিতে।

আমাদের চাকর বিষ্টু শিকলটা খুলে ঘরে ঢুকে খপ্‌ করে আমার ঘাড়টা ধরে দিলে এক ধাক্কা। আমি হোঁচট খেয়ে নীচে পড়ে গেলাম। তারপর সবাই মিলে আচ্ছা করে লাগিয়ে দিল, চাঁটি, লাথি, জুতো, ঘুসি, গাঁট্টা। উঃ! আমার হাড়গোড় ভেঙ্গে যাবার জোগাড়।

আমি যত বলি "আমি আমি" প্রহার ততই জোরে চলে।

ততক্ষণে ছোটমামা পুলিশ এনে হাজীর করেছেন।

আমাকে বাইরে নিয়ে এসে সবাই ঘিরে দাঁড়ালো।

আমি আর দাঁড়াতে পারছি না—গা টলে টলে পড়ছে—। কোনো রকমে হাত দিয়ে নিজের দাড়ীটা টেনে ছিঁড়ে ফেল্লাম।

এইবার সবার হুস হোল। সবাই আমাকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন, সবাই বলে—"আরে এ যে আমাদের নিমু—এ্যাঁ!"

আমার অবস্থা দেখে মা আর ঠাকুর-মা কাঁদতে লাগ্‌লেন।

বিষ্টু আমার পায়ে ধরে, ক্ষমা চেয়ে বল্লে—"চিন্‌তে না পেরে বে-আদবী করেছি দাদাবাবু—মাপ কর।"

ঠাকুর্দ্দা বিষ্টুকে বল্লেন—যা শীগ্‌গির আমার আল্‌-মারীতে দরদ-হারী মালিশ আছে, দাদাবাবুর সর্ব্বাঙ্গে ভালো করে মালিশ করে দে, না হলে ভয়ানক ব্যথা হবে।"

———

খিচুড়ী-বিভ্রাট

বেশ একটু ঠাণ্ডা পড়েছে।—পিসীমা ভুনি-খিচুড়ী রাঁধছেন। খিচুড়ীটা আমার চিরকালের প্রিয় জিনিষ তার উপর আজ পিসীমার রান্না—কাজেই জমবে ভালো।

রান্নার কিছু দেরী আছে তাই বৈঠকখানা ঘরে বসে আমি লালুবাবুর সঙ্গে গল্প করছি।

লালুবাবু পিসীমার সম্পর্কে দেবর হ'ন। তিনি বিকেলে বেড়াতে এসেছিলেন, পিসীমা তাঁকে আর যেতে দেন নাই, খিচুড়ী খাইয়ে তবে তাঁকে ছেড়ে দেবেন।

খিচুড়ীর গন্ধে বাস্তবিকই জিভ দিয়ে জল আস্‌ছিল; আমি বল্লাম—"লালুবাবু, আপনি বোধ হয় পিসীমার রান্না খিচুড়ী খান্ নাই, একবার খেলে আর জীবনে ভুল্‌তে পারবেন না।"

লালুবাবু বল্লেন—বৌদির হাতের খিচুড়ী আমারও পরখ করা আছে, আর সেই স্বাদ আজও ভুলতে পারি নাই বলেই তো তার এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম। বৌদি যা ডিমের খিচুড়ী রাঁধেন তার কাছে পোলাও-কালিয়া কোথায় লাগে?"

আকাশ অন্ধকার করে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি আরম্ভ হোল।

কার্ত্তিক মাস, এখন বৃষ্টি হবার কোন কথা নাই তবুও কয়েকদিন থেকে দুর্য্যোগ চলছিল।

কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ থাকার পর হঠাৎ লালুবাবু বল্লেন—"শুনুন, একটা মজার ঘটনা এই খিচুড়ী খাওয়া সম্বন্ধেই ঘটেছিল।"

উত্তর দিকের জানালাটা দিয়ে দম্‌কা হাওয়া ঘরে ঢুক্‌ছিল। জানালার সার্সিটা বন্ধ করে দিয়ে এসে আমি বল্লাম—"বলুন বলুন, এখনো খাবার অনেক দেরী আছে, ততক্ষণ মজার ঘটনাটা শোনা যাক।"

লালুবাবু পকেট থেকে ডিবে বের করে' একটিপ নস্য নাকে দিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন—

"গত বছরের কথা। দারুণ টাইফয়েড্ রোগ থেকে কোন রকমে বেঁচে ওঠার পর খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়লাম। ডাক্তাররা বল্লেন 'হাওয়া পরিবর্ত্তন দরকার, Change এ যেতে হবে আর পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে।'

গরীব মানুষ, সিমলা, দার্জ্জিলিং তো যাবার ক্ষমতা নেই, কাজেই ঠিক করলাম শিমুলতলায় যাব।

শিমুলতলায় আমার এক মামা কবিরাজী করেন। তাঁকে চিঠি লিখ্‌তেই তিনি খুশী হয়ে আমাকে যেতে লিখ্‌লেন।

মামা বিয়ে করেন নি। শিমুলতলায় একলাই থাকেন।

আমি বাড়ীর পুরোনো চাকর শিবুকে নিয়ে শিমুলতলায় এসে হাজির হলাম। মামা তো আমাকে পেয়ে বেজায় খুশী।

ছোট্ট কবিরাজী দোকান। দুটিমাত্র ঘর, যে ঘরে দোকান সেই ঘরেই তিনি থাকেন, আর অন্য ঘরটিতে হয় রান্না-বান্না আর তাঁর ওষুধ পাঁচন ইত্যাদি তৈরী।

দিন বেশ সুখেই কাটছিল, মামা আমার জন্যে একটা সালসার ব্যবস্থা করেছিলেন, সেটার এত তীব্র স্বাদ যে দুদিনের বেশী আর আমি তা ছুঁই নাই। মামা কিন্তু তা জানতেন না।

শিমুলতলার জল হাওয়া আর খাঁটি দুধ খেয়ে আমার চেহারা দু'দিনেই বদলে গেল।

আমার চেহারার পরিবর্ত্তন দেখে মামা একদিন বল্লেন—"দেখ্‌লি আমার সাল্‌সার গুণ?"

আমি বল্লাম—আলবাৎ, তা নইলে আর তোমার কাছে এসেছি কেন?"

মামা খুসী হয়ে বল্লেন—"আচ্ছা, এবার একটা পাঁচন দেব, এক এক দাগ পাঁচন খাবি আর শরীরের রক্ত হু হু করে বেড়ে যাবে।"

মামা পাঁচন দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর ভাগ্নে আর সে ওষুধের মর্য্যাদা রাখতে পারে নাই। অবশ্য মামা সে কথা জানেন না।

একদিন বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, আমি বল্লাম 'মামা আজ রাত্রে খিচুড়ী হোক।'

মামাও খিচুড়ীর ভক্ত। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী। বল্লেন—"আমার কাছে খুব ভালো ঘি আছে, কিছু ভাবতে হবে না।"

খিচুড়ীর সব আয়োজন হোল, সারা বিকেল ধরে শিবু মশ্‌লা বেটেছে। খিচুড়ীও চড়েছে এমন সময় মামার এক বন্ধু এসে বল্লেন আজ তাঁর ছেলের জন্মদিন মামাকে ও আমাকে যেতেই হবে। না গেলে তিনি খুব দুঃখিত হবেন।

ভদ্রলোকের অনুরোধ ঠেল্‌তে পারা গেল না। শিমুলতলায় আসার পর থেকে মামা তাঁর কাছ থেকে অনেক উপকার পেয়েছেন, কাজেই মামা যাবেনই, আর মামার সঙ্গে আমারও যেতে হল। কারণ মামা ছাড়লেন না!

এমন খিচুড়ীর মায়াটা ত্যাগ করতে হবে? মনটা খারাপ হয়ে গেল!

মামা শিবুকে বল্লেন—"তুই খিচুড়ী রেঁধে যতটা পারিস খাস্ আর বাকীটা না হয় রঘুয়ার মাকে ডেকে দিয়ে দিস্।"

রঘুয়ার মা আমাদের বাড়ীর পাশের একটা ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে থাকে। বেচারী ভারী গরীব; আর, তার বয়সও হয়েছে অনেক। তার একমাত্র ছেলে রঘুয়া কোথায় যে কোন কয়লা-খাদে কাজ করতে গেছে তার খোঁজ আর কেউ পায় না।

মামার বন্ধুর বাড়ী থেকে ফিরতে রাত হোল অনেক।

শিবুটা পেট ঠেসে খিচুড়ী খেয়ে সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিব্বি ঘুম লাগাচ্ছে।

'শিবু শিবু' করে কয়েকবার চেঁচিয়ে ডাক দিলাম। কিন্তু তার সাড়া শব্দ নাই।

মামা জোরে জোরে কড়া নাড়তে লাগলেন কিন্তু দরজা খোলবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

দুড়ুম-দাড়াম করে কয়েকবার জোরে জোরে দরজায় লাথি মারতে শিবুটা এসে দরজা খুলে দিল। আমি চোটে মোটে বল্লাম—"আচ্ছা বেল্লিক তো তুই? পেট ঠেসে খিচুড়ী খেয়ে তোফা ঘুম লাগাচ্ছিস্ আর, আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হিমে ভিজছি? বেটা উজবুক্ কোথাকার?"

আমার গালাগালি খেয়ে কোথায় শিবু ক্ষমা চাইবে তা না হি হি করে হাসতে আরম্ভ করে দিল।

এ কি রকম বে-আদবী? এরকম আচরণ তো তার কাছ থেকে কোন দিনও পাই নাই?

খাটের উপর আমার আর মামার বিছানা পাতা ছিল। আমার বকুনি খেয়ে শিবুটা দিব্বি ধূলো-কাদা শুদ্ধ পায়ে সেই বিছানার উপর উঠে সটান শুয়ে পড়ল।

শিবুটার মাথায় কি ভূত চাপল নাকি?

মামা বল্লেন—"কোন কারণে ওর মাথা গরম হয়েছে, বোধ হয় খিচুড়ী হজম করতে পারে নি, তাই বায়ুর বৃদ্ধি হয়েছে।"

আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলাম না। খিচুড়ী খেলে আবার কারুর পাগলামী ধরে নাকি? মামার কথায় আমার কিন্তু সন্দেহ দূর হোল না।

ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি সব ওলট্-পালট্।

মামার টেবিলটার উপর দেখি খিচুড়ীর হাড়ি বসানো, ওষুধের আলমারীর মধ্যে দেখি একগাদা ঘুঁটে আর কয়লা—আর সব থেকে মজার ব্যাপার দেখলাম মামার বেড়ালটাকে কে যেন গলায় দড়ি বেঁধে শিকের উপর

ঝুলিয়ে রেখেছে, সে বেচারা প্রাণপণে 'মিউ' 'মিউ' করে চীৎকার করছে।

এবার আমার স্পষ্ট ধারণা হোল এ ভুতুড়ে ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়।

ব্যাপার দেখে মামারও রীতিমত গোল লেগে গেছল। তিনি ব্যাপারটা ভালো করে বোঝবার জন্যে রান্না ঘরে ঢুকলেন। তারপর কি যেন সব পরীক্ষা করে চীৎকার করে বল্লেন—"ঠিক হয়েছে, এবার বুঝতে পেরেছি।"

মামার চীৎকার শুনে আমি দৌড়ে রান্না ঘরে ঢুকলাম। মামা আমাকে বাটনা বাটার শিলটা দেখিয়ে বল্লেন—"এই ত্যাখো, আজ দুপুরে এতে ওষুধের ভাং বাটা হয়েছে, শিলটা না ধুয়েই শিবু তাতে মশলা বেটেছে আর মশলার সঙ্গে যে কড়া ভাং মিশে গেছে শিবু তা টেরই পায় নি। কাজেই সিদ্ধির খিচুড়ী খেয়ে শিবুর এখন এই অবস্থা।"

এতক্ষণে ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মত সোজা হয়ে গেল। ভাগ্যিস আমরা সেই খিচুড়ী খাই নাই।

মামার ওষুধের গুণে শিবুর নেশা কাটলো বটে তবে তাকে আর কোন দিন খিচুড়ী খাওয়াতে পারি নাই।

লালু বাবুর গল্প শেষ হোলো আমাদেরও খিচুড়ী খাবার ডাক পড়লো।

ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি সব ওলট্ পালট্

চোরের উপর বাট্‌পাড়ি

ঠাকুরদার মুখে শোনা তাঁদের ছেলেবেলার একটা পুরোণো গল্প।

গাঁয়ের রাজু মিঠাইওয়ালা ছিল এক নম্বরের ঠক আর জোচ্চোর। লোক ঠকানোই যেন তার ব্যবসা। পয়সা নেবে আর জিনিষ দেবে কম আর বাসী।

গাঁয়ে আর মিঠাইয়ের দোকান ছিল না বলে সকলে বাধ্য হয়েই রাজুর দোকান থেকেই জিনিষ কিনত।

রাজুকে দেখলে বোঝাবার যো নাই সে কোনো ছল চাতুরী জানে। কপালে চন্দনের ফোঁটা, গলায় তুলসীর মালা আর তার মালা জপার বহর দেখলে মনে হয় সে যেন পাপীদের উদ্ধার করবার জন্যে পৃথিবীতে এসেছে।

লোক ঠকিয়ে রাজু পয়সাও করেছে অনেক। গরীব লোককে টাকা ধার দেয় বটে কিন্তু সময়মত সুদ না পেলে সে তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যাতে মনে হয়, তার মত কসাই আর বিশ্বভারতে দুটি নেই।

পাড়ার ছেলেরা রাজুকে দেখলেই ছড়া কাটে—

রাজু গোঁসাই
আস্ত কসাই।

রাজু ওসব কথায় কোনদিনই কান দ্যায় না। মুখে সে ভারী মিষ্টি। মিষ্টি কথা না বল্‌লে লোকে তার দোকানে আসবে কেন ? ব্যবসা তো তাকে চালাতে হবে !

পাশের গাঁয়ের হরিপদ খুব তোখোড় ছেলে। গায়ে তার যেমন বল, দৌড়তেও ঠিক তেমনি মজবুত।

একবার শহরে একটা দৌড়ের প্রতিযোগিতা হয়েছিল। তাতে প্রথম হয়ে মেডেল পেয়েছিল এই হরিপদ।

গোল্লাছুট, বৌচি, কপাটী যে কোন খেলাই হোকনা হরিপদ যে দলে থাকবে সে দল জিতবেই একেবারে ধরাবাঁধা কথা !

হরিপদর এক খুড়তুতো বোনের বিয়েতে এই রাজু মিঠাইওলা এমন বিশ্রী খাবার দিয়ে ছিল যে গ্রাম শুদ্ধ সবাই ছি, ছি, করে বল্লে—"মরলে রাজুর নরকেও স্থান হবে না।"

হরিপদকে কিন্তু রাজু চিনত না ; আর, তার বাড়ী কোথায় তাও তার জানা ছিল না।

এই হরিপদ একদিন মনে মনে একটা মতলব এঁটে সটান হাজীর হোল রাজু মিঠাইওলার দোকানে।

রাজু দোকানে বসে হরিনামের মালা জপ করছে এমন সময়ে হরিপদ এসে হাজির।

হরিপদর বয়স খুব বেশী না হলেও তাকে দেখতে একজন বেশ সভ্য-ভব্য ভদ্রলোকেরই মত !

তাকে দেখে রাজু ভাবলে, যাক একটা নূতন খদ্দের জুটলো।—তাড়াতাড়ি উঠে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করে বল্লে—"আসুন কত্তা কি চাই ?"

হরিপদ মাতব্বরি চালে বল্লে—"ভালো টাট্‌কা খাবার কি কি আছে ?"

রাজু উত্তর দিল—"আজ্ঞে, রাজু মিঠাইওলার কাছে বাসী খাবার পাবার যো নাই, সব টাট্‌কা ভাজা।"

হরিপদ বল্লে—ভালো সন্দেশ দাও আধ্‌সের, শিঙ্গাড়া দাও এক ডজন, ছানার বরফি দাও পাঁচটা আর যদি ভালো রাবড়ী থাকে তাও দাও পোয়াটাক। দোকানে বসেই খাব।"

রাজুর মুখে হাসি আর ধরে না, সকালবেলা তার বৌনিটা ভালোই হল।

তাড়াতাড়ি একটা জলচৌকি পেতে হরিপদকে মুখ-হাত ধোবার জল দিয়ে রাজু খাবার ওজন করতে লাগল।

তারপর, পাঁচ মিনিটের মধ্যে হরিপদর খাওয়া শেষ। বল্লে—"দেখি আরো কিছু গরম শিঙ্গাড়া আর ছানার গজা, পান্তোয়া থাকে তো তাও কিছু দাও।"

হরিপদ গো-গ্রাসে খাবারগুলির সদ্ব্যবহার করছে এমন সময় দেখলো বিশু গয়লা পথ দিয়ে যাচ্ছে। বিশু হরিপদর গাঁয়ের লোক, তাদের দুধ যোগায়। এ গাঁয়ে হাট করতে এসেছে।

হরিপদ ডাকল—"বিশু শোন্।" বিশু কাছে আসতেই বল্লে—"খাওয়া দাওয়া হয়েছে ?"

মাথা চুল্‌কে বিশু বল্লে—"আজ্ঞে, এখনো হয় নি, হাট থেকে ফিরে বাড়ী গিয়ে খাব।"

হরিপদ বল্লে—"কিছু খেয়ে নে" এই বলে রাজুকে বল্লে "দাওতো ওকেও কিছু খাবার।"

এমন করে সেধে খাওয়ালে কে আর না খায় ? বিশুও দেখলো তার বরাতটা আজ ভালো, বেশী কিছু আর কথাবার্ত্তা না বলে সেও টপাটপ্ খাবার গিল্‌তে লাগ্‌ল।

বিশুর খাওয়া শেষ হলে হরিপদ তার কাণে কাণে বল্লে—"ব্যাটা গিল্‌লি তো গরুর মত, ট্যাকে পয়সা কড়ি কিছু আছে ?"

বিশুর মুখ শুকিয়ে গেল। বল্লে—"কর্ত্তা সে কথা আগে বল্লেই তো ভাল করতেন।"

হরিপদ বল্লে—"তবে শীগ্‌গির পালা, রাজুর পাল্লায় পড়্‌লে আর রক্ষা থাকবে না।"

বিশু ব্যাপার বুঝে স্থুট্ করে সট্‌কে পড়ল !

হরিপদ রাজুকে বল্লে—"কত দাম হোল ?"

রাজু বল্লে—"আজ্ঞে কত্তা, দুজনের মিলিয়ে দুটাকা দশ আনা হয়েছে। তা, বৌনির সময় দু'আনা পয়সা কমই দেবেন ; আড়াই টাকার হিসাবই করলাম।"

হরিপদ প্রস্তুত হয়েই ছিল। বল্লে—"ভায়াহে আমার কাছে আড়াই টাকা কেন, আড়াই কড়াও নেই। এই আমি দৌড় দিলাম। তোমার চৌদ্দ পুরুষ যদি ঘোড়া ছুটিয়ে আসে তবুও আমাকে ধরতে পারবে না।"

এই বলে হরিপদ লাগালো তেড়ে ছুট্। রাজু মিঠাইওলা হাঁ করে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল—সে হরিপদর নামও জানে না আর হরিপদ যে কোথায় থাকে তার খোঁজও রাখে না !

কবি-ধুরন্ধর

আমাদের বাংলার মাষ্টার অনঙ্গবাবু একজন প্রতিভা-শালী কবি। অনেক নাম-জাদা কাগজে তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত তো হয়-ই—তা ছাড়া তাঁর কবিতার বইও অনেকগুলি বেরিয়েছে।

তিনি ক্লাশে ভাল ভাল বাছাই করা কবিতা আমাদের পড়ে শোনান। নিজের সদ্য লেখা কবিতা, রবীন্দ্রনাথের কাব্য, সত্যেন্দ্রনাথের রচনা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব-সাহিত্য—এই সব পড়তে পড়তে তাঁর গোঁপ আর জুলপী রীতিমত খাড়া হয়ে উঠ্‌তো।

আমরা স্পষ্ট দেখেছি রবিবাবুর "দেবতার গ্রাস" কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে চশমার ফাঁক দিয়ে তাঁর চোখ থেকে টপ্ টপ্ করে' জল গড়িয়ে পড়ছে।

অনঙ্গবাবুর একটা মস্ত দুঃখ আমাদের ক্লাশে কেউ কবি ছিল না। তিনি দুঃখ করে বলতেন—"প্রকৃত কবি না হ'লে এসব কবিতার মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারা যায় না।"

কিন্তু লালচাঁদ যে দিন আমাদের ক্লাশে ভর্ত্তি হলো সেদিন থেকেই আমরা ভাবলাম, যাক্ এতদিনে বুঝি অনঙ্গবাবুর দুঃখ ঘুচলো।

তার কারণ আছে। প্রথম দিন ক্লাশে ভর্ত্তি হয়েই লালচাঁদ জানিয়ে দিল যে সে কবিতা লেখে! সমস্ত ক্লাশময় একথা উত্তেজনার ঢেউ খেলে গেল।

প্রথমতঃ কেউ কেউ কথাটা বিশ্বাস করতে চায় নাই, কিন্তু সে তক্ষুনি তার অঙ্কের খাতার উল্টো পিঠে fountain penএ সবুজ কালী দিয়ে তর্ তর্ করে লিখে গেল—

যেমন ঝরণা জল নেমে আসে অবিরল
ঝর্ ঝর্ পর্ব্বত গাত্রে,—
তেমনি আকুল পারা আমার কবিতা ধারা
নেমে আসে সদা দিবা রাত্রে।

ব্যস্, এর থেকে আর বড় প্রমাণ কি হ'তে পারে?

সেদিন অনঙ্গবাবু ক্লাশে আস্তেই আমরা লালচাঁদকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম।

অনঙ্গবাবু বল্লেন—"বেশ বেশ, তুমি বুঝি কবিতা লিখতে পার?

লালচাঁদ সোজাসুজি উত্তর দিল—"হ্যাঁ স্যার"

"তোমার নাম কি?"

"লোহিত চন্দ্র অর্থাৎ লালচাঁদ—'

"বাড়ী কোথায়?"

"ভট্টপল্লী অর্থাৎ ভাটপাড়ায়—"

"এর আগে কোথায় পড়তে ?

"চট্টগ্রামে অর্থাৎ চাটগাঁয়ে—"

আমরা মনে মনে ভাবলাম, ঈস্ কবি না হলে কি এমন ক'রে কেউ কথা বলতে পারে ?

লালচাঁদকে পেয়ে আমাদের সকলেরই কবি হবার ঘুমন্ত ইচ্ছা গা ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

কিন্তু শুধু ইচ্ছা হলেই তো আর হয় না। গায়ের জোরে পালোয়ান হওয়া যায় কিন্তু কবি, গায়ক, চিত্রকর এই সব হওয়া তো আর মুখের কথা নয়।

গোপনে গোপনে আমরা সবাই কবিতা লিখবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু সে চেষ্টাই সার হতো। যদিও বা মেরে ধরে' এক লাইন লেখা গেল কিন্তু তার পরের লাইন আর কিছুতেই মাথায় আস্‌তে চাইতো না। তারপর মিল ঠিক হওয়া চাই—ছন্দের গোলমাল্ হলে চলবে না। এমনি আরো কত কি ছাই ভস্ম।

কিন্তু লালচাঁদ ? ও স্বভাবিক কবি—ওর ভাবতে হয় না এতটুকু।

কাল অঙ্কের মাষ্টার বঙ্কুবাবু যখন ক্লাশে অঙ্ক বোঝাচ্ছিলেন—সেই সময় লালচাঁদ লিখে ফেল্লে—

বঙ্কুবাবুর আজ অঙ্কের ক্লাশ,

ব্লাকবোর্ডে হিজিবিজি—মাইনাস্, প্লাস,—
ঘূম ধরে—ওঠে হাই,
মনোযোগ মোটে নাই,
সরবৎ খাই যদি পাই এক গ্লাস।

পরের ঘণ্টায় আমরা এই কবিতাটি অনঙ্গ বাবুকে দেখালাম!

তিনি কবিতাটি পড়ে' গম্ভীর হয়ে বল্লেন—'হাঁ কবিতা ভালোই হয়েছে—তবে মাষ্টার কিংবা গুরুজনদের নিয়ে কোন কবিতা লিখো না। ভাল ভাল subject নিয়ে কবিতা লিখবে।"

তারপর তিনি সবাইকে বল্লেন—"আচ্ছা কাল তোমরা সবাই 'সূর্য্যোদয় সম্বন্ধে কবিতা লিখে এনো—দেখা যাক্ কার কতটা কবিত্বের দৌড়।"

পরের দিন আমরা সবাই কবিতা লিখে এনেছি। অনঙ্গবাবু একে একে কবিতা পড়তে লাগলেন। তিনি আর হেসেই বাঁচেন না—কত সব অদ্ভুত ভাব, ভাষা, মিল, ছন্দ, কেউ কেউ আবার খাঁটি গদ্য ভাষাই পদ্যের আকারে লিখে এনেছে।

যা' হোক কয়েকটি কবিতা বেছে বেছে তিনি পড়ে শোনাতে লাগলেন।—

রমেশ লিখেছে—

সূর্য্যের উদয় হোলো—

ওরে ভাই হাই তোলো—

ছাড় ছাড় এইবার শয্যা—

ছারপোকা কাম্‌ড়েছে

ঘাড় পিঠ ফুলে গেছে—

ছারপোকাগুলো ভারী বজ্জাত্।

সূর্য্যোদয় সম্বন্ধে এমন মৌলিক কবিতা আর কেউ শুনেছি কি?

অনঙ্গ বাবু বল্লেন—"ওহে তোমাকে ছারপোকা সম্বন্ধে লিখতে বলি নাই—'সূর্য্যোদয়' সম্বন্ধেই বলেছি।"

জনার্দ্দন লিখেছে—

আকাশে উঠেছে সূর্য্য টক্‌টকে লাল—

প্রকাণ্ড যেন এক মুস্থরীর ডাল।

কবিতা শুনে আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠ্‌লাম।

অনঙ্গবাবু বল্লেন—"এইবার পঞ্চাননের কবিতা।" এই রে, এইবার আমার কবিতা;—আমার বুক্ দুড়্ দুড়্ করতে লাগ্‌লো।

অনঙ্গবাবু পড়তে লাগলেন—

উদিত সূর্য্যের অর্ক অম্বর কুট্টিমে
সাড়ম্বরে বিঘোষিছে বৈজয়ন্তী তার,
বিশ্ব দৃশ্য পরিস্ফুট,…শর্ব্বরী অতীত
আবির্ভূতা উষা দেবী…করি নমস্কার।

অনঙ্গবাবু বল্লেন—“Idea ভালো, তবে ভাষা বড় কাঁমট…আরো সোজা হওয়া উচিত।”

তারপর জগত্তারণের কবিতা…

শুনিয়াছি সূর্য্য তুমি ওঠো খুব ভোরে…
চক্ষে কভু দেখি নাই…থাকি ঘুম ঘোরে,
আট্‌টার আগে কভু শয্যা নাহি ছাড়ি,
কেমন তোমার শোভা বলিতে না পারি।

জগত্তারণ খাঁটি কথাই লিখেছে…সে বেচারীর ভাগ্যে আর ‘সূর্য্যোদয় দর্শন ঘটে ওঠে না।

বিনোদ লিখেছে…

সূর্য্যোদয় দেখিলাম কালে প্রভাতের…
কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে ইতস্ততঃ চাহি…ইত্যাদি,

একে একে সকলের কবিতাই পড়া হয়ে গেল…কিন্তু লালচাঁদের কবিতা কই?

অনঙ্গবাবু বল্লেন—“লালচাঁদ তুমি লেখ নাই?”

“না স্যার…”

"কেন ?"

"এক্ষুনি লিখে দেবো স্যার Black Boardএ"… !

এ না হলে কি আর কবি ? বাড়ীতে বসে তো সবাই ভেবে চিন্তে লিখতে পারে। অভিধানও দেখা যায়, এখান-ওখান থেকে টুকেও আনা যায় আবার কারুর কাছে জিজ্ঞাসা করেও লেখা যেতে পারে। সত্যি কথা, আমার কবিতাটা লিখতে ছোট মামার যথেষ্ট সাহায্য আমি পেয়েছি…ছোট মামা বেশ কবিতা লিখতে পারেন।

অনঙ্গ বাবু বল্লেন…"আচ্ছা, তুমি Black Boardএ গিয়েই লিখে দাও।"…

আমরা অবাক্ হয়ে রইলাম… লালচাঁদ খড়ি দিয়ে লিখে যেতে লাগলো…

আকাশের কুঁড়ে ঘরে লাগিল আগুণ,
দমকল্…কোথা দমকল্ ?…
লালে লাল হয়ে গেল অনন্ত অম্বর,
ভীত পাখী করে কোলাহল।
ঘুচিল সবার ভয়…লাগেনি আগুণ
উদিলেন প্রশান্ত ভাস্কর…
সুনীল আকাশ পাখী পাড়ে যেন ডিম
দিশা-হারা কবি ধুরন্ধর।

আমরা স্তম্ভিত হয়ে লালচাঁদের কবিতা লেখা দেখছিলাম। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে অনঙ্গবাবু বল্লেন—"থাক।"

লালচাঁদের কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে আমরা সেই থেকে তাকে "কবি ধুরন্ধর" বলে ডাক্‌তাম্।
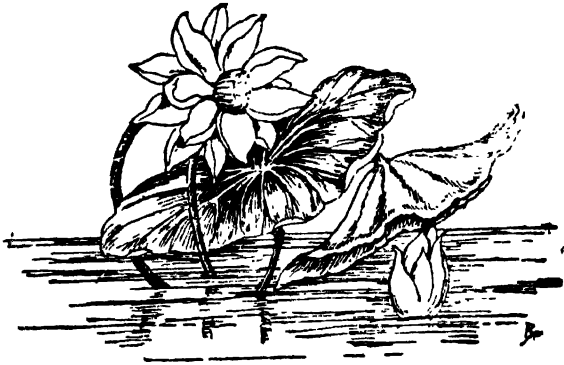
সুন্দর বনে সুন্দর সিং

সুন্দর সিং যেদিন প্রথমে আমাদের বাড়ীতে দ্বারোয়ানের কাজে বহাল হোলো তার চেহারা দেখে আমাদের কুকুরগুলো দস্তুরমত খাব্‌ড়ে গিয়ে চীৎকার করে উঠেছিল।

ভয় পাবে না কেন? ও রকম প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া চেহারা আর গোঁফের বহর দেখে কুকুর তো কুকুর আমরাও প্রথমে রীতিমত ভড়কে গিয়েছিলাম!

রাত্তির বেলা বাঁশের লাঠি কাঁধে উঁচিয়ে সে যখন নাগরাই জুতো মস্‌মস্‌ কর্‌তে কর্‌তে বাড়ী পাহারা দিত—চোর ডাকাতের সাদ্ধি ছিল কি সে দিকে এগোয়!

সুন্দর সিংয়ের চেহারার মধ্যে একটু খুঁত ছিল—তার ডান পাটা ছিল একটু খোঁড়া, আর, বাঁ হাতের দুটো আঙ্গুল ছিল কাটা।

সুন্দর সিংএর আফিং খাওয়ার অভ্যাস ছিল। তাই পাড়ার ছেলেরা তাকে ক্ষেপিয়ে ছড়া কাট্‌ত—

সুন্দর সিং
খায় আফিং ;—

সুন্দর সিং বহুদিন হল আমাদের কাজ ছেড়ে চলে

গেছে। তবে তার কথা প্রায়ই মনে হয়, আর তার সম্বন্ধে আলোচনা আমরা এখন প্রায় সময়ই করে থাকি। একদিনের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল।

সুন্দর সিংএর বাড়ী থেকে একখানা চিঠি এলো… তার মাসতুতো ভাই শার্দ্দুল সিং মারা গেছে। খবরটা তাকে তখন জানানো হোল না! মা বল্লেন—"এখন খবর জান্‌লে, সে আর খাবে-দাবে না। অনর্থক কাঁদা-কাটি করবে।"

ঠিক হোলো দুপুরের খাওয়ার পর তাকে এই দুঃসংবাদটা দেওয়া হবে। এই অপ্রীতিকর কাজের ভারটা পড়লো আমারই উপর।

দুপুর বেলা পেট ভরে রুটি আর ছোলার ডাল খেয়ে সুন্দর সিং আমাদের উঠানে দাঁড়িয়ে দাঁতে খড়কে দিচ্ছে, এমন সময় আমি জড়সড় হয়ে গিয়ে বল্লাম,—"সুন্দর সিং, একটা খবর এসেছে তোমাদের বাড়ী থেকে।"

সুন্দর সিং,—"কী খবর দাদা বাবু?"

আমার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করছে—তার বিপদের খবর দিতে আমিই মহা বিপদে পড়ে গেলাম। হাত-পা কাঁপতে লাগলো নাক দিয়ে প্রবলভাবে

গরম নিশ্বাস বেরুতে লাগ্‌লো! তবু কোনো রকমে এক নিঃশ্বাসে বলে ফেল্লাম—"তোমার ভাই শার্দ্দূল সিং মারা গেছে।"

সুন্দর সিং তড়াক্ ক'রে এক তিন হাত লাফ দিয়ে বল্লে—"ওঃ, বাঁচা গেছে!—ব্যাটা আমার কাছে অনেক টাকা পেতো।"

তার ব্যাপার দেখে আমি ত হতভম্ব! খাবার আগে সে খবরটা পেলে বোধ হয় সে 'ডবল' খেয়ে ফেলত।

সুন্দর সিং আমাদের অনেক রকম মজার মজার সব আজগুবি গল্প বলত। তার জীবনে না।ক অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে।

কিন্তু তার সুন্দর বনের গল্পটা আমরা আজও ভুলতে পারি নাই। সেই গল্পটাই যতদূর মনে পড়ে বলছি।—

সুন্দর সিং ছেলেবেলায় একবার তার ঠাকুর্দ্দা বন্‌বন্ সিংএর সঙ্গে সুন্দর বনে গেছিল। বন্‌বন্ সিং জরীপের কাজ করত। সুন্দর সিং একবার বায়না ধরল সেও সুন্দর বন দেখতে যাবে। আদুরে নাতীর কথা ঠেল্‌তে না পেরে বন্‌বন্ সিং তাকে নিয়ে সুন্দর বনে গেল।

সুন্দর বন যে কত ভয়ঙ্কর জায়গা সুন্দর সিং তা প্রথম দিনেই টের পেল।

তারা থাকতো নদীতে নৌকার উপরে। দিনের বেলাতেই সে চেয়ে দেখতো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব ঘোড়ার মত কেঁদো কেঁদো বাঘ নদীর ধারে বসে হাই তুলছে। বুনো হাতীর পাল বন তোলপাড় ক'রে হুল্লোড় বাধিয়েছে, মোটা মোটা সব বিকট রকম সাপ গাছ থেকে 'সড়াক্' করে পিছলে পড়ে আস্ত আস্ত হরিণ গিলে খাচ্ছে, এক একটা কচ্ছপের মত রাক্ষুসে কাঁকড়া দাড়া বাগিয়ে ছুটে চলেছে। এমনি সব কত কি, তার চোখে পড়তো হরদম্।

শুধু কি তাই? নৌকাতেই একটু অসাবধান হয়েছ কি,—বাস্! আর কথাবার্ত্তা নেই একদম্ কুমীরের পেটে।

একদিন সুন্দর সিং তাদের দলের সঙ্গে নৌকাতে বসে রয়েছে, হঠাৎ শুনতে পেল ডাঙ্গার উপর ভীষণ গর্জ্জন। সবাই চেয়ে দেখে, বাপরে, এক হাতীর সঙ্গে লেগেছে এক বাঘের মল্লযুদ্ধ। ওঃ! সে কী লড়াই! দিনের আলোতে বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

সুন্দর সিং বেশ মজা করে তাদের লড়াই দেখতে

লাগলো। এক একবার হাতীর লাথির ঘায়ে বাঘ দাঁত ছিরকুটে পড়ে, আবার বাঘের বিরাশী সিক্কার চাঁটি খেয়ে হাতী হয় কাবু। এমন সময়ে হঠাৎ বন্‌বন্‌ সিংএর বন্দুকের গুলিতে দু জনেই কুপোকাৎ। কাজেই লড়াইয়ের শেষটা আর দেখা হোলো না।

সুন্দর সিং একদিন বেড়ানো শেষ করে নৌকায় ফিরছে। সঙ্গীরা সব নৌকায় উঠে পড়েছে, কেবল সেই উঠতে বাকী। এমন সময় ধরলো এক কুমীর তার ঠ্যাং কাম্‌ড়ে।

কেবল কুমীর হলেও ছিল রক্ষে। হঠাৎ কোথা থেকে এক ইয়া জাঁদরেল হাতীর মত কেঁদো বাঘ এসে তার বাঁ হাতটা কামড়ে ধরলো। তারপর সুরু হলো রীতিমত 'টাগ-অফ্‌-ওয়ার'।

বাঘ টানে উপরের দিকে আর কুমীর টানে জলে—সুন্দর সিংএর আত্মারাম খাঁচা ছাড়া!

দলের লোকেরা ত ভয়ে মহা হল্লা সুরু করে দিয়েছে; কি যে করবে কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছে না। বন্‌বন্‌ সিংও তখন ফেরে নি, সুতরাং সুন্দর সিংএর বাঁচার আশা সবাই দিল ছেড়ে।

হঠাৎ হোলো এক অদ্ভুত কাণ্ড! প্রকাণ্ড এক অজগর

একটা গাছের ওপর থেকে ঝুকে প'ড়ে টপাং করে বাঘটাকে গিল্‌তে সুরু করল। বাঘ যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে সুন্দর সিংকে দিল ছেড়ে! কিন্তু কুমীরের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় কি? সে যে তাকে জলে টেনে নিয়ে চল্ল!

কিন্তু রাখে কেষ্ট মারে কে? হঠাৎ 'দুড়ুম' করে এক শব্দ, আর সঙ্গে সঙ্গে কুমীর মশায় ঘায়েল। বন বন্ সিং ফিরে এসেই এই কাণ্ড দেখে তাকে উদ্ধার করেছে।

তার এই গল্প আমাদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হতো না। কিন্তু তার খোঁড়া পা আর বাঁ হাতের কাটা আঙ্গুলে যে জলজ্যান্ত প্রমাণ রয়েছে, তাই বা অস্বীকার করি কি করে?

সেদিন হঠাৎ সুন্দর সিংএর জ্ঞাতিভাই কুদরৎ সিংএর সঙ্গে দেখা। সম্প্রতি সে দেশ থেকে এসেছে।

সুন্দর সিংএর সুন্দরবনের গল্পটা তাকে বলতেই সে হো হো করে হেসে বল্লে—"সুন্দর সিং কোনো কালেই সুন্দরবনে যায় নাই, আর বন্‌বন্ সিং বলেও তার কেউ ছিল না।"

আমি বল্লাম,—সুন্দর সিংএর খোঁড়া পা আর কাটা আঙ্গুল আমরা স্বচক্ষে দেখেছি—কুমীর ও বাঘে ধরার গল্প তা'হলে আর কি ক'রে অবিশ্বাস করা যায়?

দারুণ রকম অট্টহাসি হেসে কুদরৎ সিং বল্লে—"আমাদের ও ধোঁকা লাগিয়ে বোকা বানিয়ে গেছে।

তার পর সুরু হলো রীতিমত 'টাগ-অফ্-ওয়ার'

ছেলেবেলায় গাছ থেকে পড়ে তার পাখানা খোঁড়া হয়ে যায়।"

আমি বল্লাম,—"তা হলে আঙ্গুল ভুটোর ও অবস্থা হোলে কি করে ?"

কুদরৎ সিং বল্লে—"সে তো বাঁশ কাট্‌তে গিয়ে কাটারীর কোপ লেগে ওর আঙ্গুলের এই অবস্থা হয়েছিল।"

আমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে কুদরৎ সিংএর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

দিল্লীকা লাড্ডু

চোখে কালো চশমা, ঝোড়ো কাকের মত চুলগুলো, পায় ময়লা ক্যান্‌ভাসের' জুতো, একটা স্যুটকেশ হাতে দুপুর বেলা হঠাৎ গঙ্গারাম বাড়ীতে এসে হাজীর হোলো।

দুই মাস আগে চাক্‌রী করতে যাচ্ছি' বলে—হঠাৎ গঙ্গারাম যে কোথায় কর্পূরের মত উবে গেছিল তার খোঁজ আর এতদিন আমরা পাই নি।

আজ তাকে এই বেশে হঠাৎ ফিরতে দেখে আমরা প্রশ্নে প্রশ্নে তাকে দস্তুর মত অস্থির করে তুললাম।

গঙ্গারাম কোন কালে যে জীবনে কিছু উন্নতি করবে সে আশা বাড়ীর লোকেরা সবাই অনেক দিনই ছেড়ে দিয়েছিল।

ছেলে বেলা থেকেই বেচারীর শরীরে যেন রাজ্যের অসুখ 'মৌরসী পাট্টা' গেড়ে বসেছিল।

গেঁটে বাত, পেটে পিলে, হাঁপানি, আর তার উপর ছিল ম্যালেরিয়া।

এই রোগগুলোর তদারক করতে করতেই বেচারী

গঙ্গারামের ত্রিশ ত্রিশটা বছর পার হয়ে গেল। তার জীবনের যত কিছু সুখের স্বপ্ন এই রোগগুলি ধারালো করাতের মত ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে' কেটে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়েছিল।

ব্যাচারী গঙ্গারামের কি দোষ? তারপর সেদিন যখন তার জ্যাঠামশাই বল্লেন—"হতভাগা বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত বাপ-জ্যাঠার অন্নগুলি বসে বসে গোরুর মত গিলছ!" তখন গঙ্গারাম আর স্থির থাকতে পারল না।

গঙ্গারাম ভাবলে সেতো মানুষ, সত্যিই তো সে কেন অন্যের পয়সা খাবে—তারও হাত পা আছে, থাকুক না শরীরে রোগ! রোগ কার না হয়......

জ্যাঠামশাইয়ের উপর তার রাগ হোলনা একটুকুও— ধিক্কার এলো নিজের উপর।

তার পরেই গঙ্গারাম উধাও। অনেক চেষ্টা করেও এতদিন তার খোঁজ আমরা পাই নি।

আজ দুই মাস পর তাকে ফিরতে দেখে আমাদের আর কৌতূহলের শেষ নাই।

গঙ্গারাম বল্লে, সে দিল্লী থেকে আসছে...টিমারপুরে সে একটা চাকুরী পেয়েছে—পনের দিন পরে গিয়েই চাকরীতে যোগ দিতে হবে। এই কয়দিনের জন্যে সে

বাড়ীতে দেখা-শোনা করতে এসেছে, পাঁচ বছরের মধ্যে সে আর ছুটি পাবে না।

সন্ধ্যার সময় চায়ের দোকানে আমার গঙ্গারামের সঙ্গে দেখা।

গঙ্গারাম পিরিচে চা ঢেলে চুমুক দিচ্ছিল—আমাকে দেখে বল্লে,—"এস দাদা, একটু গল্প-সল্প করা যাক্‌… দাওতো হে নবীন, বাবুকে কড়া করে' বড় এক কাপ চা'—

এই কয়দিনেই গঙ্গারামের চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে—দেখে মনে হল দিল্লীর জল হাওয়ায় তার ব্যাধিও বোধ হয় দেহ ছেড়ে পিট্টান দিয়েছে।

নানা রকম গল্প করতে করতে হঠাৎ আমার চোখ পড়লো গঙ্গারামের নাকের উপর। নাকের ভাগটা বেশ টক্‌টকে লাল্‌ হয়ে উঁচু বলের মত হয়ে আছে।

আমি কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম,—"নাকে আবার কি হ'ল গঙ্গারাম?"

গঙ্গারাম বল্লে,—"আরে ভাই, দিল্লীকা লাড্ডু খেয়ে এই ব্যাপার হয়েছে।"

আমি বল্লাম—"কি রকম? কি রকম?"

গঙ্গারাম আর এক পেয়ালা চায়ের হুকুম দিয়ে বলতে আরম্ভ করলে।

"শোন সেই মজার ব্যাপার। ছেলেবেলা থেকেই দিল্লীকা লাড্ডুর নাম শুনে আসছি। তাই দিল্লী গিয়েই প্রথমে ইচ্ছা হল এই অপূর্ব্ব জিনিষটাকে স্বচক্ষে দেখতে হবে। না হলে জীবনই বৃথা। কারণ শুনেছিলাম, দিল্লীকা লাড্ডু যো খায়া উভি পস্তায়া যো নাহি খায়া উভি পস্তায়া—কাজেই ভাবলাম না খেয়ে পস্তানোর চেয়ে খেয়ে পস্তানোই ভালো।

বাজারে বাজারে ঘুরে দিল্লীকা লাড্ডু অনেক রকমেরই দেখলাম। কিন্তু সেই 'দিল্লীকা লাড্ডুর খোঁজ আর পাই না!

চাকর পঞ্চুলালকে মনের ইচ্ছা জানালাম। পঞ্চু প্রতিজ্ঞা করলে ২।৪ দিনের মধ্যেই আমাকে সেই চির বাঞ্ছিত দিল্লীকা লাড্ডু খাওয়াবেই খাওয়াবে।

এখানে আসবার কিছুদিন আগে একদিন সন্ধ্যার সময় আমি কাজ থেকে বাড়ী ফিরেছি এমন সময় পঞ্চুলাল আমায় এসে বল্লে—"আমাকে আজকে রাত্রের মত ছুটি দিন একটা বিয়ের নিমন্ত্রণে যেতে হবে। 'দিল্লীকা লাড্ড' আমি যোগাড় করে রান্নাঘরের তাকের উপর রেখে দিয়েছি।"

পঞ্চুলাল পশ্চিমা লোক। আমাকে অবশ্য হিন্দী

ভাষাতেই কথাগুলো বল্লে। বোঝবার সুবিধার জন্যে আমি কথাগুলোকে এখন বাংলা করে' বল্লাম।

পঞ্চুলালের কথা শুনে আমি আনন্দে মেতে উঠ্‌লাম। ভাবলাম যাক্ এতদিন পর পঞ্চুলালের কৃপায় বরাতে দিল্লীকা লাড্ডুর দর্শন মিলল। তক্ষুণি পঞ্চুলালের ছুটি মঞ্জুর করলাম। পঞ্চু নিমন্ত্রণ খেতে চলে গেল।

আমি হাত মুখ ধুয়ে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

পঞ্চুটা নিমন্ত্রণ খাবার আনন্দে আলোটা পর্য্যন্ত জ্বেলে রেখে যায় নি। দেশলাইটাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এদিকে দিল্লীকা লাড্ডুর জন্যও প্রাণটা ছট্‌ফট্ করছে।

ভাবলাম মরুক গে দেশলাই, তাকের উপরেই তো লাড্ডুগুলো আছে খুঁজে পেতে আর কষ্ট হবে না।

রান্না ঘরটা ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। একটা নতুন্ দেশলাই কিনে এনে আলোটা যে জ্বালাবো তারও তার সইছে না।

হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে লাগলাম।

পূবদিকের জানালার উপর যে তাকটা ছিল মনে হ'ল তাতে একটা ধামা রয়েছে। ভাবলাম যাক এতক্ষণে লাড্ডুর সন্ধান পাওয়া গেছে।

মনের আনন্দে ধামায় গিয়ে হাত দিলাম।

আরে বাপরে এ যে মস্ত লাড্ডু।

ভীষণ রকম বোঁ বোঁ আওয়াজ শুনে চমকে উঠ্‌লাম। মনে হোল রান্নাঘরের সমস্ত অন্ধকারটা যেন গোঙাতে আরম্ভ করেছে।

দারুণ রকম ভড়কে গিয়ে পা হড়কে গেলাম পড়ে। তারপর নাকে মুখে চোখে উঃ সে কি জ্বলুনি। কারা যেন আমার সমস্ত শরীর ছোবল্‌ মেরে ফির্‌তে লাগল।

চীৎকার করে বাহিরে চলে এলাম। সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। তারপর সে রাত্রে এলো কাঁপুনি দিয়ে জ্বর।

ভোর বেলা পঞ্চুলাল এলো। আমার অবস্থা দেখে তার তো চক্ষুস্থির। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে ব্যাপারটা জেনে এলো দিল্লীকা লাড্ডুর ধামার বদলে আমি অন্ধকারে ভীমরুলের চাকে হাত দিয়েছি।

পঞ্চুলাল আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইল।

তার কি দোষ? সে বল্লে "আলো জ্বেলে রেখে গেলে আর এই কাণ্ড হোত না। ভীমরুলের চাকটা যে কবে থেকে ওখানে আছে তা আমরা কেউ জানি না।" এই পর্য্যন্ত বলে গঙ্গারাম একটি বিড়ি ধরিয়ে টান্‌তে লাগলো। পাশের দোকানের ঘড়িতে টংটং করে আটটা বেজে গেল।

কারা যেন···ছোবল মেরে ফিরতে লাগলো

আমি বল্লাম—"এবার ওঠা যাক !"

গঙ্গারাম তার গল্পের জের টেনে আবার বল্ল—"দাদা নাকের দাগটা এখনো মিলায় নাই তবে ব্যথা অনেকটা কমে গেছে। সেই দিল্লীকা লাড্ডুর কামড় খাবার পর থেকে আমার হাঁপানীর টান আর হয় নাই, বাতের ব্যথাও সেরে গেছে, আর, ম্যালেরিয়া হয় সে কথাও প্রায় ভুলতে বসেছি।"

গঙ্গারামের গল্প শুনে আমি আর থাকতে পারলাম না, চিৎকার করে টেবিল্ চাপড়ে বলে উঠলাম···

"সাবাস দিল্লীকা লাড্ডু।

সেই থেকে ভীমরুল দেখতে পেলেই আমরা বলে উঠি —"ঐ দিল্লীকা লাড্ডু চলেছে।"

পোড়ো বাড়ী

জীবনে অনেক ঘটনাই ঘটেছে কিন্তু যে ঘটনাটার কথা আজ বল্‌তে আসছি সে কথা ভাব্‌লে এখনো ভয়ে আতঙ্কে মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে—।

হাজারীবাগে থাকতাম। কল্‌কাতা থেকে আমার পুরানো বন্ধু দিব্যেন্দু হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়ী এসে হাজীর।

দিব্যেন্দু ভালো শিকারী। খবরের কাগজে সে পড়েছে হাজারীবাগে বড় বাঘের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে—তাই হঠাৎ তার আবির্ভাব। শিকারীদের নেশা বড় ভয়ঙ্কর। ভালো শিকারের খবর পেলে তারা আর থাক্‌তে পারে না—।

বাঘের গন্ধে দিব্যেন্দু তাই কল্‌কাতা থেকে আপিস কামাই করে এতটা পথ ছুটে এসেছে!

দিব্যেন্দুর মত্‌লব্‌ শুনে বাড়ীর গুরুজনেরা খুব বেশী উৎসাহ দিলেন না। কারণ কিছু দিন আগে দু'জন খুব পাকা শিকারী বাঘের মুখে ঘায়েল হয়েছে।

দিব্যেন্দু বড় একগুঁয়ে।

সে বল্লে—'অন্য যে কোন পাকা শিকারীর সঙ্গে দিব্যেন্দুর তফাৎ আশমান জমীন্।"

আমি বল্লাম—"কেন মিছে বেঘোরে প্রাণটা দেবে, তার চেয়ে যখন এসেছো, দুদিন খাও দাও, বেড়াও তার পর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।"

দিব্যেন্দু বল্লে—"এই জন্যেই তো বাঙ্গালীর ভীতু নামটা আজও ঘুচলো না—"

তার সঙ্গে বেশী তর্ক করতে যাওয়া বৃথা। ঠিক হোল পরদিনই দিব্যেন্দু বাঘ শিকারে বেরবে।

সে রাত্রে শুয়ে শুয়ে আমার মনেও নানা কথা জাগতে লাগল। দিব্যেন্দু আমার সমবয়সী—সেও বাঙ্গালী আমিও বাঙ্গালী, অথচ তাতে আর আমাতে কত তফাৎ। নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে সে এতদূরে ছুটে এসেছে আর আমরা তাকে সবাই মিলে বাধা দিচ্ছি। এই রকম করে বাধা পেয়ে পেয়েই তো আমরা একজায়গায় থমকে দাড়িয়ে আছি—আর অন্য অন্য জাতেরা আমাদের পিছনে ফেলে হু হু করে এগিয়ে চলেছে। আমাদের প্রতি পদেই বাধা। আমরা যখন ঘর-কুনো হয়ে আছি তখন অন্যান্য জাতেরা হিমালয় পাহাড় ডিঙ্গবার চেষ্টা করছে, অতল সমুদ্রের

তলায় গুপ্ত রত্নের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আগ্নেয় গিরির গহ্বরের মধ্যে নেমে যাচ্ছে—

ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমার মাথা গরম হয়ে উঠল। নিজের প্রতি একটা ধিক্কার এল। ঠিক করলাম কাল আমিও দিব্যেন্দুর সঙ্গী হব খুব গোপনে।

বাড়ীর কেউ জান্‌লে নিশ্চয়ই যেতে দেবেন না।

সকাল বেলা উঠেই আমার মনের ইচ্ছাটা দিব্যেন্দুকে জানালাম।

দিব্যেন্দু বল্লে—"ভাই, নিজের দায়িত্বে যেতে চাও তো চল, কিন্তু বাড়ীর অনুমতিটা নেওয়া একান্ত দরকার, না হলে যত দোষ সমস্ত পড়বে আমার ঘাড়ে। অবশ্য যতক্ষণ আমার ধড়ে প্রাণ আছে ততক্ষণ তোমার ক্ষতি করে এমন কেউ এই দুনিয়াতে নেই।"

আমি বল্লাম—"কেউ জান্‌তে পারবে না। আমি শুই বাইরের ঘরে, বাড়ীর সঙ্গে সে ঘরের কোন সম্পর্কই নেই, খাওয়া-দাওয়ার পর চুপে চুপে বেরিয়ে পড়লে কেউ পাত্তাও পাবে না—। ভোরের বেলাতেই আবার ফিরে আস্‌ব। যদি বাঘ মারা পড়ে তখন না হয়, দুজনে মিলেই বাহাদুরীটা নেওয়া যাবে।"

যেই কথা সেই কাজ। খাওয়া-দাওয়ার শেষে

রাত্রি প্রায় দশটার পর দুজনে বাঘ শিকারে বেরিয়ে পড়লাম।

দিব্যেন্দুর গায়ে পুরাদস্তুর শিকারীর পোষাক। কাঁধে টোটাভরা দোনালা বন্দুক। আমার হাতে একটা বল্লম আর টর্চ্চ।

এই বল্লমটা আমি আগে থাক্‌তেই ঠিক করে রেখেছিলাম পাশের বাড়ীর দারোয়ান রামভজন সিংয়ের কাছ থেকে।

ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার রাত। চারিধার ঝিম্ ঝিম্ করছে। আশেপাশের ঝোপ্‌ঝাড় থেকে অবিশ্রাম ঝিঁঝির ডাক কানে আস্‌তে লাগল।

বাড়ী থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দূরে ভেলোয়ারের জঙ্গল। তীব্র টর্চ্চের আলোতে দেখলাম জঙ্গলের ধারে একটা পোড়ো বাড়ীর মত কি যেন দেখা যাচ্ছে।

বাড়ীটা নজরে পড়তেই দিব্যেন্দু বল্লে—"ঠিক হয়েছে" বাড়ীটার আশে পাশে গভীর জঙ্গল, এখানে আশ্রয় নিলেই আমাদের কাজ চল্‌বে,বাঘের দেখা এখানেই মিলবে, কষ্ট করে' আর গাছে বা মাচায় উঠতে হবে না।"

আমি বল্লাম—"কি করে বুঝলে বাঘের দেখা এখানে পাওয়া যাবে?"

দিব্যেন্দু বল্লে—"ঐ দ্যাখো ঘরটার পাশেই খানিকটা জলা জায়গা···জল খেতে বাঘ নিশ্চয়ই এ জায়গায় আস্‌বে।"

জলা জায়গাটার কাছে এসে বাস্তবিকই আমি 'থ' খেয়ে গেলাম। জায়গাটার আশে-পাশে বাঘের বড় বড় পায়ের ছাপ।

বাড়ীর ভিতরে আমরা দুজনে গিয়ে ঢুকে পড়লাম। হয়তো কোন সময়ে এখানে লোক বাস করত, কিন্তু এখন-কার অবস্থা দেখলে মনে হয়না কোনকালে এর ত্রি-সীমানায় কোন লোক ছিল। চারিধারে আগাছার জঙ্গল আর কাঁটা গাছের ঝোপ।

সাবধানে পা ফেলে ফেলে আমরা একটা ঘরে গিয়ে উঠ্‌লাম। দরজা খোলাই ছিল।

ভিতরে ঢুকতেই একটা পচা বিশ্রী গন্ধ ভক্ করে আমাদের নাকে এসে ঢুক্‌লো। আমাদের শব্দ পেয়ে কতকগুলো চামচিকি ডানা ঝট্‌পট্ করতে করতে ঘর থেকে উড়ে পালিয়ে গেল।

আমি দিব্যন্দুকে বল্লাম—"কাজ নাই। এই জায়গা থেকে চল পালাই। আমার কেমন ভয় ভয় করছে!"

দিব্যেন্দু আমার কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বল্লে—

"তোমাদের ভয় কথায় কথায়। এই জঙ্গলে একটা বাড়ীর সন্ধান পেয়েছ' সেই জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও ; নইলে এতক্ষণ তোমাকে বাইরে আমার সঙ্গে' গাছে চড়ে বস্‌তে হোত। সেটাই কি ভালো হোত নাকি ?"

দিব্যেন্দুর কথা শেষ হতে না হতেই আমি পায়ের কাছে ফোঁস করে একটা আওয়াজ পেলাম। টর্চ্চের আলো সেই দিকে ফেলতেই দেখি, বাপ্‌রে! প্রকাণ্ড এক গোখরো সাপ তেড়ে আসছে আমাদের দিকে।

দুড়ুম্‌ করে এক আওয়াজ হোল, দেখি দিব্যেন্দুর বন্দুকের নল থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে আর সামনে উল্‌টে পড়ে আছে গোখরো সাপটা।

দিব্যেন্দু হি হি করে হেসে বল্লে···"যাক্‌ বউনিটা আজ ভালই হোল।"

গভীর রাত, ঘরের একটা জানালা খুলে আমরা চুপ-চাপ বাঘের আশায় বসে আছি। কিন্তু বাঘের সঙ্গে আর দেখা নাই। আমার চোখ ঘুমে ঢুলে আসছে।

আমি বিরক্ত হয়ে বল্লাম—"দূর ছাই, চল বাড়ী ফেরা যাক্‌ বাঘ-ফাগের দেখা এদিকে মিল্‌বে না। কাল বরং অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।"

দিব্যেন্দু বল্লে—"না, হে না, মাছ ধরবার নেশা আর

বাঘ মারবার নেশা ঠিক একই রকম, যার যত বেশী ধৈর্য্য তারই তত জিত হয়।”

দিব্যেন্দুর কথা শেষ হতে না হতেই বাইরে বাঘের গর্জ্জন শোনা গেল। উঃ যেন বাজের আওয়াজ! আমার ঘুম-টুম কোথায় গেল উড়ে, বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করতে আরম্ভ করল।

কিছুক্ষণ পরেই তাকিয়ে দেখলাম—বাহিরের ঘুট-ঘুটে অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে আগুনের ভাঁটার মত দুটো চোখ জ্বল্ জ্বল্ করছে।

গুড়ুম গুড়ুম দুবার বন্দুকের আওয়াজ হোল আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই জ্বল্ জ্বলে চোখ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

দিব্যেন্দু বল্লে—“এই যা, একটুর জন্যে ফস্‌কে গেল …আচ্ছা ছাড়া হবে না…”

বল্‌তে বল্‌তে সে বিদ্যুতের মত বেগে বাইরে ছুটে গেল। আমি হতভম্বের মত পড়ে রইলাম। একা সেই গভীর জঙ্গলের পোড়ো বাড়ীর মধ্যে।

অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যে টর্চ্চটা রেখেছি তারও কোন খোঁজ পাচ্ছি না। উঃ কি গভীর অন্ধকার! দিব্যেন্দু না ফেরা পর্য্যন্ত আমায় এভাবেই থাকতে হবে। সম্বল আমার শুধু একমাত্র সেই বল্লমখানা।

কিছুক্ষণ চুপ চাপ বসে আছি। হঠাৎ শুন্‌লাম পাশের ঘরে খড়ম পায়ে দিয়ে কে যেন খট্ খট্ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুনে আমার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। মাথা ঘুরতে লাগল, পা টল্‌তে স্থরু করল, তবু যথাসম্ভব মনে জোর এনে ভাঙ্গা গলায় চীৎকার করে বলাম—"কে রে ?"

কেউ উত্তর দিলে না।

স্পষ্ট শুন্‌তে পেলাম সেই খট্ খট্ শব্দ আস্তে আস্তে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চৌকাঠ পার হয়ে আমার ঘরে ঢুকল। অন্ধকারে কারুকে দেখতে পাচ্ছিনা। বেশ টের পেলাম আমার চার পাশে কে যেন খড়ম পায় দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এ অবস্থায় তোমরা কি করতে জানি না, আমি একবারে মরিয়া হয়ে উঠলাম, বল্লমটা হাতে করে তুলতে গিয়ে দেখি বল্লম নেই……

খুব ভীতু মানুষও দারুণ ভয় পেলে হঠাৎ বেজায় রকম সাহসী হয়ে পড়ে। আমারও হোল তাই। আমি ক্ষেপে উঠলাম। অন্ধকারে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীর ভাবে বল্লাম—"কে, শীগ্‌গির সাড়া দাও…বন্ধু, এখনি বন্দুক নিয়ে ফিরে আসবে তা হলে আর রক্ষা থাকবে না।

কোন উত্তর নেই। আবার সেই খট্ খট্ শব্দ।

কি যে করব কিছুই ভেবে কুল-কিনারা পাচ্ছিনা। হঠাৎ ঘরের ছাদের কাছ থেকে এক ঝলক্ আলো আমার মুখের উপর এসে পড়ল।

চম্‌কে উটে তাকিয়ে দেখি আমার টর্চ্চটা শূন্যে ঝুলছে আর কে যেন সেই টর্চ্চের আলো আমার মুখের
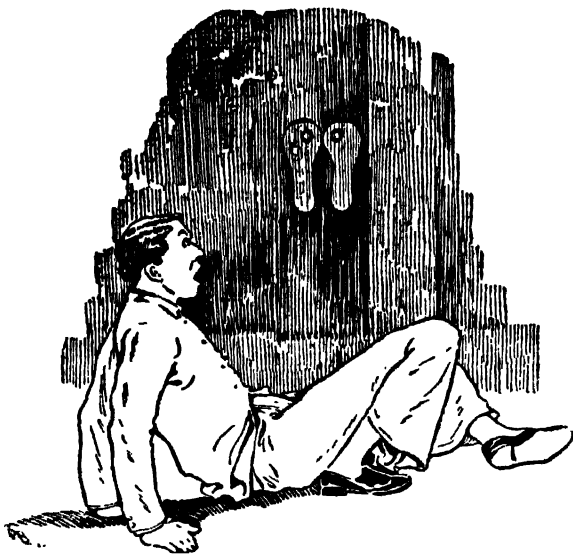
নাকের সামনে ঝুলছে দু'খানা প্রকাণ্ড খড়ম।

ওপর ফেলছে আর তার পাশে শূন্যে ঝুলছে আমার বল্লমখানা। লোকজন কোথাও কেউ নাই। ব্যাপারটা

যে সম্পূর্ণ ভূতুড়ে এ বিষয় আর কিছু মাত্র সন্দেহ করবার কারণ রইল না।

টর্চের আলো নিভে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বেগ্‌নে তীব্র আলোতে ঘরখানা ভরে গেল। সেই আলোতে দেখি আমার নাকের সামনে ঝুলছে দুখানা প্রকাণ্ড খড়ম।

আবার অন্ধকার! আবার আশে পাশে সেই খট্‌ খট্‌ শব্দ।

শব্দটা আবার চৌকাঠ পার হয়ে বাইরে চলে গেল। আমিও যেন কতকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

দিব্যেন্দুর উপর আমার ভয়ঙ্কর রাগ হতে লাগলো— বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে নিজেও মরবে আমাকেও মারবে। ঐ দুজোড়া পেল্লায় খড়ম দিয়ে যদি সেই অদৃশ্য খড়মের মালিক আমাকে পিষে ফেলে—তা হলে কি আর রক্ষে আছে?

এই রকম ভাবছি হঠাৎ জানালার গায়ে একটা আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি, আগুনের মত গন্‌গনে দুটো চোখ জ্বলছে। চমকে উঠলাম। সেই বাঘটা নাকি? জানালার কাছ থেকে সরে পিছু হটে দাঁড়ালাম। তারপর কি যে কাণ্ড হোল ভাবতে এখনো শরীরের রক্ত জল হয়ে যায়।

ঘরের মধ্যে যেদিকে তাকাই সেই রকম আগুনের ভঁাটার মত চোখ জ্বলছে—রাশি রাশি হাজার হাজার। সমস্ত অন্ধকারটা চোখের আগুনে যেন আলো হয়ে উঠল। সেই আলোতে দেখলাম হাজার হাজার শাদা ধব্‌ধবে মুলোর মত দাঁত লক্‌ লক্‌ করছে।

তারপর আর আমার কিছু মনে নাই।

যখন জ্ঞান হলো…তাকিয়ে দেখলাম পাশে দিব্যেন্দু দাঁড়িয়ে আর তার পাশে প্রকাণ্ড এক মরা বাঘ।

টল্‌তে টল্‌তে দিব্যেন্দুর কাঁধে ভর দিয়ে যখন বাড়ী পৌঁছলাম তখনো ভোর হতে দেরী আছে।

বাড়ীতে একথা আর কারুকে বল্লাম না। আমি যে দিব্যেন্দুর সঙ্গী হয়েছিলাম সে খবরও কেউ জানতে পারলেন না।

* * * *

দিব্যেন্দুর সঙ্গে সেই থেকে আর দেখা হয় নাই।

ভেলোয়ারের জঙ্গলের ধারে সেই পেড়ো বাড়ীখানা আজও তেমনি ভাবে ঠায়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রাত্রি বেলা যদি কেউ সেই বাড়ীর ধার দিয়ে যায় তবে শুনতে পাবে খড়মের আওয়াজ হচ্ছে—খট খট্‌ খট্‌।

কীর্ত্তিপদর কীর্ত্তি

বঙ্গেশ্বর বাবু বেজায় ভাবনার মধ্যে পড়ে গেছেন।

দেশে যেটুকু জমি জমা ছিল তা' বিক্রি করে' সেই টাকা দিয়ে সম্প্রতি কল্‌কাতায় এসে 'ডিণ্ডিম' নামে তিনি একখানি দৈনিক কাগজ বের করেছেন।

কিন্তু কাগজের কাট্‌তি নাই একেবারে। দুই পয়সা দামের কাগজ এখন এক পয়সায় নেমেছে—তবু কাগজের চাহিদা নাই।

বঙ্গেশ্বর বাবুর বরাৎ মন্দ। প্রথম প্রথম 'হকার'রা কিছু কিছু কাগজ চালাতো বটে, কিন্তু এখন আর তারাও নিতে চায় না। জোর করে' তো আর ভদ্রলোকদের কাগজ গছানো যায় না! 'ডিণ্ডিম' বিক্রি করে' 'হকার' দের কোন লাভ নাই! তাই তারা এখন আর বঙ্গেশ্বর বাবুর কার্য্যালয়ের ছায়া মাড়ায় না।

প্রথম প্রথম কাগজ ছাপানো হোত এক হাজার—তারপর পাঁচশ থেকে এখন আড়াইশ' তে এসে দাঁড়িয়েছে। তাও সবই প্রায় পড়ে থাকে। কেন—এর অর্থ কি?—অন্য অন্য কাগজের থেকে 'ডিণ্ডিম' কোন্ বিষয়ে খারাপ? তার সম্পাদকীয় স্তম্ভ, সংবাদ বিভাগ,

খেলাধূলার বৃত্তান্ত, কোন্ কাগজের থেকে নিকৃষ্ট ? 'ডিণ্ডিমের ছাপা, কাগজ, ভাষা, ভঙ্গি কোন্ কাগজের থেকে হীন ? বরাৎ ··বঙ্গেশ্বর বাবুর বরাৎ !

এত সহজেই হাল ছেড়ে দিলে চলবেনা। দেশের যেটুকু সামান্য জমীদারী ছিল তাও গেছে ; এখন এই কাজটিকে আবার তুল্‌তে না পারলে—শেষে যে ভাতে টান পড়বে !

বঙ্গেশ্বর বাবু অস্থির হয়ে পড়লেন !

কাগজ বিক্রী হয় না—কাজেই বিজ্ঞাপণ পাওয়া ভার। যারা আগে আগে খাতিরে পড়ে বিজ্ঞাপণ দিয়েছিল—তারাও তুলে নিয়েছে। প্রেসের কর্ম্মচারীদের মাইনে বাকী,—তারা বারে বারে শাসাচ্ছে—কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। যেটুকু পুজি বঙ্গেশ্বর বাবুর ছিল তাও নিঃশেষ প্রায়।—হায়, হায়, হায়,—বঙ্গেশ্বর বাবুর অবস্থা অতি শোচনীয়। বঙ্গেশ্বর বাবুর কি দোষ ? একান্ত শত্রু না হলে 'ডিণ্ডিম' কাগজের নিন্দা কেউ করতে পারে না !

আমরা নিজেরা কয়েক সংখ্যা 'ডিণ্ডিম' পড়ে দেখেছি —অনেক আজে বাজে কাগজের থেকে তার অনেক অংশ শ্রেষ্ঠ। 'ডিণ্ডিমের' সম্পাদকীয় মন্তব্য অতি মূল্যবান, দেশ বিদেশের খবর সব আন্‌কোরা টাট্‌কা, ছাপা,—

কাগজ ঝক্ ঝকে,—এক কথায় বল্‌তে গেলে অন্য দশটী শ্রেষ্ঠ কাগজের মধ্যে 'ডিণ্ডিম'ও একখানা। তারপর 'ডিণ্ডিমে' আবার ছবি ছাপা হয়। এক পয়সা কোন্ কাগজ ছবি ছাপতে সাহস করে?

বঙ্গেশ্বর বাবুর কোন দোষ নাই,—সম্পাদকের দিক থেকে তাঁর কোন ক্রটী নেই, দোষ তাঁর অদৃষ্টের। 'ডিঙ্গিমের সহকারী সম্পাদক কীর্ত্তিপদ বাবু দূর সম্পর্কে বঙ্গেশ্বর বাবুর মামাতো ভাই!

ডিণ্ডিমের অবস্থা দেখে কীর্ত্তিপদ বাবুও বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। ডিণ্ডিমের সঙ্গে তাঁর অদৃষ্টও বিশেষ-ভাবে জড়ীত।

কীর্ত্তিপদ বাবু 'মরীয়া' হয়ে উঠ্‌লেন। যে করেই হোক্ কাগজ খানার কাট্‌তি বাড়াতেই হবে,—রামা শ্যামা যে-সে কাগজ ছাপিয়ে ফেঁপে উঠল—আর তাঁরাই কি এত অক্ষম? না,—একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে।

সেদিন সকালে 'ডিণ্ডিম' কাগজ মাত্র তিনখানা বিক্রী হয়েছে। বঙ্গেশ্বর বাবু হতাশ হয়ে কীর্ত্তিপদ বাবুকে বল্লেন—"ওহে কীর্ত্তিপদ, যা হবার তা হয়েছে—কাগজ ভুলে দাও,—এ ভাবে আর কত ডোবা যায়?"

কীর্ত্তিপদ বাবু ভিতরে ভিতরে বেজায় রকম দমে

গেছেন। কিন্তু সে ভাব যথা সম্ভব গোপন রেখে হাসি হাসি মুখে বল্লেন"যখন ডুবেছি, তখন একবার পাতাল্‌টা দেখে আসা দরকার।"

বঙ্গেশ্বর বাবু বিরক্ত হয়ে বল্লেন—"ঠাট্টার আর সময় নাই। গাঁটে আর এমন কড়ি নাই—যা দিয়ে এই ভূতের বেগার খাটা যায়। এ দিকে বাড়ীওলা নালিশ রুজু করেছে,—প্রেসের কর্ম্মচারীরা একেবারে মারমুখো।" কীর্ত্তিপদ বাবু বাইরে আরো উৎসাহের ভাব এনে বল্লেন—"আচ্ছা আরো কয়েকটা দিন দেখা যাক—তারপর যা কর্‌তে হয় করা যাবে।

বঙ্গেশ্বর বাবু বল্লেন "আমার শরীর মন অত্যন্ত খারাপ,—আমি চল্লাম বাড়ীতে। তুমি কয়দিন চেষ্টা করে দ্যাখো—আমি আর এ বিষয়ে মাথা ঘামাতে পারছি না।

* * * *

সারা সহরে হুলস্থূল। আজ সকাল বেলায় দৈনিক কাগজ 'ডিণ্ডিমে' বড় বড় অক্ষরে এই খবর গুলি ছাপা হয়েছে,—

১। মহাত্মা গান্ধির ৫০ঘণ্টা ব্যাপী হেতুয়ায় সন্তরণ;

২। ষ্টার রঙ্গমঞ্চে চাণক্যের ভূমিকায় আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র;

৩। ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে, রবীন্দ্র নাথের অসাধারণ ক্রীড়া নৈপুণ্য ;

৪। ভাওয়াল সন্ন্যাসীর গাত্র হইতে বহুমূল্য অলঙ্কার অপহৃত ;

৫। প্রফুল্ল ঘোষের অনশন ব্রত উদযাপন ;

৬। শিশির ভাদুড়ী খাদি আশ্রমে অভিনন্দিত ;

৭। উড়ো জাহাজে গোষ্ঠ পালের পারস্য যাত্রা ;

৮। গোপাল গঞ্জের মহারাণীর পূর্ব্বে দাড়ী ছিল কি না ?

আজ আর অন্য কাগজের কাট্‌তি নাই। সহরের যত হকার এসে বারে বারে হানা দিচ্ছে 'ডিণ্ডিম' কার্য্যালয়ে। কাগজের দাম এক পয়সা থেকে দুই আনায় —ক্রমে চার আনায় দাঁড়াল। তবুও কাগজের অসম্ভব চাহিদা। 'ডিণ্ডিম' আজ আর আড়াইশ নয় বিশ্‌ হাজার ছাপা হয়েছে। কীর্ত্তিপদ বাবুর আজ আর বিশ্রাম নাই, —ঠং ঠং করে খালি টাকা বাজাচ্ছেন আর দেরাজে ভরছেন—তাঁর আর নাওয়া খাওয়ার ফুরসৎ নাই। বঙ্গেশ্বর বাবু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে কীর্ত্তিপদ বাবুকে বল্লেন "সর্ব্বনাশ! করেছ কিহে,—এই রকম জ্বলজ্যান্ত মিথ্যা কথাগুলো কাগজে বের করেছ"? কীর্ত্তিপদ বাবু দেরাজ

খুলে একরাশ টাকা পয়সা নোট বঙ্গেশ্বর বাবুর সামনে ধরে' বল্লেন—ওসব কথা পরে হবে এখন, এই নিন আজকের কাগজের বিক্রী প্রায় তিন হাজার টাকা ; বাড়ী ভাড়াটা আজকেই চুকিয়ে নিন,—পরে আবার দেখা যাবে। অত গুলো টাকা সামনে দেখে বঙ্গেশ্বর বাবু চম্‌কে গেলেন,—বল্লেন "কিন্তু কাল্‌কে তো আর একখানাও কাগজ বিক্রী হবে না—এ রকম মিথ্যা সংবাদ লোকে নিশ্চয়ই বরদাস্ত করবে না।'

কীর্ত্তিপদ বাবু বল্লেন—"সে যা হয় আমি ব্যবস্থা করব। আপনি আজ আর বাইরে বেরুবেন না। 'ডিণ্ডিম' সম্পাদক বলে অনেকেই আপনাকে চেনে আজ আপনাকে রাস্তায় দেখলে কেউ আর আস্ত রাখ্‌বেনা। আমি একবার চট্‌ করে দেখে আসি মহাত্মাজীর সাঁতার দেখ্‌তে হেদোয় কিরকম ভীড় হয়েছে।—"

*

পরদিন সকালবেলা 'ডিণ্ডিম' কাগজে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অক্ষরে ছাপা হোলো—

ক্ষমা প্রার্থনা

প্রেসের গোলমালে কাল আমাদের কাগজে একটি সংবাদ মারাত্মক রকমের ওলোট্‌ পালট্‌ হইয়া

গিয়াছে,—সেগুলি আজ সংশোধন করিয়া বাহির কর.
হইল। এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য করযোড়ে আম
ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। খবর গুলি এইরূপ হইবে ;

১। মহাত্মা গান্ধির অনশন ব্রত উদ্‌যাপন ;

২। ষ্টার রঙ্গমঞ্চে চাণক্যের ভূমিকায় শিশির ভাদুড়ী

৩। ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে গোষ্ঠ পালের অসাধা
ক্রিয়া নৈপুণ্য ;

৪। ভাওয়াল সন্ন্যাসীর পূর্ব্বে দাড়ি ছিল কিনা ?

৫। প্রফুল্ল ঘোষের ৫০ ঘণ্টা ব্যাপী হেদুয়ায় সন্তর

৬। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র খাদি আশ্রমে অভিনন্দিত

৭। উড়ো জাহাজে রবীন্দ্রনাথের পারস্য যাত্রা ;

৮। গোপালগঞ্জের মহারাণীর গাত্র হইতে বহু
অলঙ্কার অপহৃত

'ডিণ্ডিমের' অবস্থা ফিরে গেছে। দেশের লো
নজর এখন ডিণ্ডিমের দিকে। সহরে তো কথাই ন
মফঃস্বলেও তার অসম্ভব কাটতি।

বঙ্গেশ্বর বাবুর চিন্তা দূর হয়েছে। আর কীর্ত্তিপদ
কীর্ত্তিপদ বাবু নতুন মটর কিনেছেন,—আর বালী
লেকের ধারে জমি কিনিবার ফিকিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে

সমাপ্ত